লোকশিল্প

সৈয়দ মাহবুব আলম

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোকশিল্প

গ্রন্থকার
সৈয়দ মাহবুব আলম

প্রথম প্রকাশ
জুন '১৯৯৯

প্রচ্ছদ
জসীমউদ্দিন

আলোক চিত্র
মোঃ শফিকুর রহমান

মুদ্রণ
এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস।
৪৩/১০ সি স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৫৪৬১৩, ৯৫৫৫৯৩৭ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৬৬৭৩৫৯
E-mail : asiatic@bangla.net.

প্রকাশনা
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন,
ডাকঘর ঃ আমিনপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

মূল্য ঃ একশত তিরিশ টাকা।

LOKOSHILPA (Folk Art) Collection of essays on folk art and crafts of Bangladesh. By Syed Mahbub Alam. Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation, Sonargaon, Narayangonj, Bangladesh. First Edition: June 1999. Price: Tk 130.00

উৎসর্গ

সোনারগাঁয়ে লোকশিল্পের ঐতিহ্যের
"প্রাণের পটভূমি"-বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
স্বপ্নদ্রষ্টা
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে

ভূমিকা

সৈয়দ মাহবুব আলমের লোকশিল্প শীর্ষক গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে পেরে আমি আনন্দিত।। বাংলাদেশে ফোকলোরের লোকশিল্প শাখাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শত সহস্র বছর ধরে আমাদের লোকশিল্পী এবং সাধারণ মানুষেরা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সংগে সম্পর্কিত করে তাদের স্বপ্ন, ভাবুকতা, বোধ বিশ্ববীক্ষা বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে লোকশিল্পের মাধ্যমে অনন্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফলে লোকশিল্পে আমাদের জনজীবনের নানা ঐতিহাসিক স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং মুল্যবোধ বাঙময় হয়ে উঠেছে।

আমাদের লোকশিল্প নিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং বিবরণধর্মী কিছু কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক লোকশিল্প ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রকরণ তাতে অনুপস্থিত। সৈয়দ মাহবুব আলম এ বিষয়ে সচেতন থেকেই তাঁর লেখাগুলো প্রস্তুত করেছেন। তিনি লোকশিল্প বিষয়ে পূর্ববর্তী ধারা থেকে নিঃসন্দেহই অগ্রগামী পদক্ষেপ ফেলেছেন। লোকশিল্প ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ফোকলোরবিদেরা ছোট প্রেক্ষাপটে (Small setting) এবং বৃহৎ প্রেক্ষাপটে (Big setting) শিল্প ও শিল্পীর উপস্থাপন করে থাকেন। ফলে শিল্পীর কাজের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলীকরণ, তার ছবি সংযুক্তকরণ এবং সাক্ষাৎকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে এবং এর মধ্য দিয়েই সৃজন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট নির্ণয় করা হয়। সৈয়দ মাহবুব আলম সে চেষ্টাও করেছেন। আমি মনে করি তাঁর বইটি আমাদের লোকশিল্প সংক্রান্ত প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করবে।

শামসুজ্জামান খান
মহা পরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

গ্রন্থকারের কথা

লোকশিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যিক ধারা। এসত্ত্বেও লোকশিল্পের গবেষণা মূল্যায়নের বিষয়টি আমাদের দেশে কখনও গুরুত্ব পায়নি, গতানুগতিক বিবরণমূলক পর্যালোচনা, শিল্পসমালোচনা বা নিতান্তই 'ফোকলোরের' একটি অপ্রধান শাখা হিসেবে এর গবেষণা ও মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ।

যেহেতু বাংলাদেশের লোকশিল্প ঐতিহ্যিক লোকসমাজের সৃষ্টি, এর সঙ্গে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনধারা, বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত, সেহেতু এ বিষয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন সংস্কৃতির নিরিখে বহুমাত্রিক ধারায় পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া এবিষয়ে যথাযথ গবেষণা ও মূল্যায়ন হলে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে লোকশিল্পের প্রবহমান ধারার সম্মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আমি লোকশিল্পের গবেষণা ও মূল্যায়নে বহুমাত্রিক গবেষণা পদ্ধতির ধারা সনাক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছি। এবং গবেষণা পদ্ধতির কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারার আলোকে লোকশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে বেশকিছু গবেষণামূলক কাজ করি। তারই সামান্য প্রকাশ এই লোকশিল্প গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত মোট ১২টি প্রবন্ধ গত দশবছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে লোকশিল্পের নানা দিক: ঐতিহ্যের রূপ; ব্যক্তি শিল্পী - কারুশিল্পী; লোকশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশকেন্দ্রিক যাদুঘর ব্যবস্থা এবং লোকশিল্পের ঐতিহ্যের শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। লোকশিল্প গ্রন্থটি গবেষক ও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে আমার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

লোকশিল্প গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার স্নেহভাজন সহকর্মী বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের গবেষণা অফিসার বিশ্বনাথ সরকার, সংরক্ষণ অফিসার রবিউল ইসলাম, আলোকচিত্রী মোঃ শফিকুর রহমান এবং ফাউণ্ডেশনের প্রাক্তন প্রদর্শন অফিসার জসিমউদ্দিনের আন্তরিক সহযোগিতা লোকশিল্প গ্রন্থটির প্রকাশকে সহজতর করেছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সোনারগাঁও
নারায়ণগঞ্জ

সৈয়দ মাহবুব আলম

সূচীপত্র

১।	লোক শিল্প ঃ প্রসঙ্গ মাটি	৯
২।	বাংলাদেশের চিত্রিত হাঁড়ি	১৪
৩।	রাজশাহীর শখের হাঁড়ির একজন শিল্পী	২০
৪।	বাংলার বয়ন শিল্প	২৯
৫।	নকশী কাথার অতীত, বর্তমান এবং রূপান্তরের ধারা	৩৬
৬।	বাংলাদেশের দারুশিল্প	৫৭
৭।	সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের খেলনা ও পুতুল	৬৩
৮।	মানিকগঞ্জের বাঁশের কারুশিল্পের একজন কারু শিল্পী	৭২
৯।	লোক ও কারুশিল্প, লোক মেলা, লোকজ উৎসব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ	৯১
১০।	লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংরক্ষণে উন্মুক্ত যাদুঘর	১০৪
১১।	কারুশিল্প গ্রাম	১১৫
১২।	লোক ও কারুশিল্পের গতি ও প্রবহমান ধারা	১২৫
১৩।	আলোকচিত্র	১৩১

লোক শিল্পঃ প্রসংগ মাটি

কোন কিছু তৈরি, সৃষ্টির জন্য মানুষ তার অনুভব ও চেতনাকে ব্যবহার করে। এই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা পরিচয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। মানুষ তার চারপাশের উদার, সদয় প্রকৃতির উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত ও উপলব্ধির ক্ষমতা রাখে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশেই মানুষের জীবনাচারণ পরিবেষ্টিত। মানুষ প্রতিনিয়ত মানুষের, মানবজাতির প্রয়োজনে ক্রমাগ্রসরমান পদ্ধতির ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহারের কাজে লিপ্ত ও আত্মনিয়োগ করেছে। উদ্ভাবনী শক্তি ও ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমশ তার আয়ত্তে নিয়ে আসা দক্ষতাকে সূক্ষ্ম, সুরুচিসম্পন্ন এবং নিয়মাবদ্ধের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করেছে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ জীবনের প্রয়োজনে, তাগিদে, পারিপার্শ্বিকতার অনিবার্যতায় কিছু তৈরি, নির্মাণ এবং সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টিতে স্বভাবতই মানুষের জীবনযাপন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, কল্পনা, অনুভব ও চেতনা, প্রযুক্তিগত কৌশল ও দক্ষতার প্রতিফলন রয়েছে। বোধকরি সকল কাজে যা সৃষ্টি হয়, রূপলাভ করে, মানুষের তা সৃষ্টি করতে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। মানুষ প্রতিনিয়ত তার চারপাশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন-যাপনের, জীবনের অস্তিত্বের সংগ্রামের প্রয়োজনে হাত ও হাতিয়ারের সম্মিলনে কাজের মধ্য দিয়ে যে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, আয়ত্তে আনে তা অবশেষে প্রায়োগিক পদ্ধতিতে বা প্রযুক্তিতে পরিণত হয়। পরিণত হয় সংস্কৃতির অনুষঙ্গে। প্রকৃতির সকল উপাদান, উপকরণকে এই পদ্ধতিতে, কৌশলে প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে কাজে লাগায়, ব্যবহার করে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে জীবন-যাপনের প্রয়োজনে চলতে গিয়ে প্রতিদিনের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানা বস্তু, গড়ন, রূপ এবং কল্পনাকে সৃষ্টি করছে। সৃষ্টি করছে তার অনুভব ও চেতনার জগৎ। প্রকৃতির সহজলভ্য উপাদান মাটি, গাছপালা, পানি, রঙ দিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজনে বস্তু, আকার, গড়ন তৈরি করে চলেছে। মানুষের আয়ত্তাধীন প্রায়োগিক কৌশল প্রযুক্তির কল্যাণেই মানুষের পক্ষে এ ধরনের কর্ম সম্ভব। মানুষ এভাবেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার ক্রমপুঞ্জিত ইতিহাসের ধারায় জীবনে চলার পথে, সংগ্রামের মধ্য

দিয়ে যে জীবনাচারণের চিহ্ন, প্রমাণ রেখে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে একটি পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে চলেছে তা কালক্রমে সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হয়। এসবই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। পৃথিবীর অঞ্চল ভেদে, দেশ ভেদে মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিবেচনায় রেখে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যমূলক স্বতন্ত্র পরিচয়ের সংস্কৃতিধারা গড়ে তুলেছে। প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমূলক সংস্কৃতি সৃষ্টি করে চলেছে। এভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমূলক সংস্কৃতির পরিচয় তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে বিধৃত। সাধারণ জনজীবনের প্রাত্যহিক বিষয়, পোশাক, পাত্র, অস্ত্র, পুতুল, মূর্তি, শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে সৃষ্ট বিচিত্র সংস্কৃতিসমূহের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আমরা জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চারপাশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহকে ব্যবহারের প্রমাণ ঐসব নিদর্শনে মেলে। মানুষ প্রযুক্তিগত কৌশল ও দক্ষতাকে অবলম্বন করে নানা প্রয়োজনীয় ও সৌন্দর্যের বস্তু, গড়ন, রূপ নির্মাণ বা তৈরি করেছে। মানুষ প্রযুক্তিগতকৌশল আয়ত্তের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমারেখায় নিজ পরিবেশ, সমাজ সংগঠন, ধর্ম এবং সর্বোপরি সংস্কৃতি সৃজনে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই পৃথিবী জুড়ে সংস্কৃতির মানচিত্র গড়ে উঠেছে। ভৌগলিক, স্থানিক পরিবেশের অবিচ্ছেদ্যঅঙ্গ মানুষের সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতই হচ্ছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাই বিশ্বে অঞ্চলভেদে সৃষ্টি, বিকশিত হয়েছে নানা নামের, নানা বৈশিষ্ট্যের সংস্কৃতি। যেমন ভারতীয়, চীনা, মিসরীয়, মেসোপটেমিয়া, ইনকা, আজটেক, আরবীয়, ইরানী ইত্যাদি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির কারিগর সাধারণ মানুষ। কখনো রাজপরিবার, রাজা -সম্রাট বা ধর্ম সংস্কৃতির রূপ, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করলেও মৌলিকভাবে সংস্কৃতির মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে প্রতিটি সংস্কৃতির পরিচয়ের মূল মাপকাঠি সেখানকার মানুষের-নৃগোষ্ঠীর জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রকৃতিকে কিভাবে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়, তার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ সবই মানুষ অভিজ্ঞতার আলোকেই শিখে নেয়। এভাবেই মানুষের আয়ত্তে আসে প্রযুক্তি ও দক্ষতালব্ধ অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা তার চারপাশের প্রাকৃতিকপরিবেশকেন্দ্রিক। ফলে প্রকৃতির সংগে মানুষ খাপ খাইয়ে নেয় তার প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার আলোকে। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে মানুষের সৃষ্ট বস্তুজাত সংস্কৃতি (Material Culture)। এজন্য সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, বর্ণনা প্রাসঙ্গিক (Contextual) হওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত। বস্তুজাতসংস্কৃতির নিদর্শনের পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে বিচার -বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হলে সংস্কৃতির সামগ্রিক বিষয় উন্মোচন সহজ হবে। বস্তুজাতসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে এর কারিগর, শিল্পী-মানুষ তার অনুভব, চেতনা, কল্পলোক, ধর্ম, আচার-আচরণ, জীবনযাপন, উপকরণ-কাঁচামাল, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয়, পরিবেশে মানুষের অবস্থান এবং পরিবেশের বিশেষত্ব। এক কথায় মানব জীবনের আচরণের সার্বিক দিক। এছাড়াও আরো খুঁজে পাওয়া যাবে

জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচার প্রয়োজনে, মানুষ কিভাবে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করেছিল। তার প্রমাণও মিলবে বস্তুজাত সাংস্কৃতিক উপাদানে, নিদর্শনে। সমাজের যৌথ আকাঙ্খার প্রতিফলন হিসেবে মানুষ সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের চিত্রকল্প, রূপ ও গড়ন সৃষ্টি করেছে কল্পলোকে, লোক-সাহিত্যে, লোক সংগীতে, লোকনৃত্যে এবং বস্তুজাতভাবে লোক-শিল্পে ও স্থাপত্যে।

প্রাচীনকালে সারা বিশ্বেই দৈনন্দিন প্রয়োজনে মাটির পাত্র গড়তো। কিন্তু অঞ্চল ভেদে মৃৎপাত্র ভিন্ন ভিন্ন গড়নের ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এক রকমের বা অভিন্ন গড়নের ও বৈশিষ্ট্যের নয়। ফলে একটি অঞ্চলের মৃৎপাত্র থেকে অন্য অঞ্চলের মৃৎপাত্রের পার্থক্য নির্ণয় ও সনাক্ত করা সম্ভব। এতে পার্থক্য চোখে পড়বে মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে, তৈরির ও পোড়ানোর পদ্ধতিতে। এর সব কিছুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি নির্ভর করে এবং এ অবস্থার নিরিখে মানুষ বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত পোড়ামাটির পাত্রসহ মাটির তৈরি অন্য জিনিসপত্র তৈরি করে। পাত্রের গড়নের পার্থক্য নির্ধারিত হয় অঞ্চল ভেদে, মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি, খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের উপর। মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্যে যেমন অঞ্চল ভেদে পার্থক্য সূচিত হয়, তেমনি কালভেদেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষণীয়। অন্য দেশের মৃৎপাত্রের অনুকরণ বা প্রভাবের ফলেও মৃৎপাত্রের গড়নে ও বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখা দেয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে প্রকৃতির একক অবিচ্ছেদ্য উপাদান মাটি দিয়ে মানুষ নানা বস্তু, জিনিস তৈরি করছে। আমাদের মাতৃভূমি-স্বদেশ আর মাটি অভিন্ন রূপ। মাটিতে গাছপালা জন্মে, মাটি গাছের জীবন রক্ষা করে, ফসল জন্মে, মানব জীবনকে রক্ষা করে। মাটির আর একটি রূপ হচ্ছে কাদা। প্রাচীন কালের মানুষ কাদামাটি দিয়ে যে নানা রকমের জিনিসপত্র গড়া, সৃষ্ট করা যায় তা জানতো। তারা নানা গড়ন, আকারের পাত্র তৈরি করতো। আগুনে পুড়িয়ে স্থায়ী গড়নের গুণ ও বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করার প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ও দক্ষতা তাদের জানা ছিল। বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচায়ক প্রতিটি অঞ্চল ও দেশের মানুষ কাদামাটিকে যে কোন গড়নে সহজে রূপান্তরযোগ্য নমনীয় উপরকণ (Plastic material) হিসেবে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বের প্রায় সকল প্রাচীন সংস্কৃতির পোড়ামাটির পাত্রসহ মাটির জিনিসপত্রের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনই তার প্রমাণ।

বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপনকারী নৃগোষ্ঠী এদেশের পরিবেশের নিরিখে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। নদ-নদীর দেশ বাংলাদেশ। আদি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যা আজকের পদ্মা, মেঘনা, যমুনার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাংলার মানচিত্র জুড়ে শোভা পাচ্ছে। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষ এই অসংখ্য নদী কেন্দ্রিক সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বসবাস,জীবনযাপন করছে। নদীর দুই তীরে শহর, বন্দর, গঞ্জ, গ্রাম ও জনপদ গড়ে উঠেছে। নদীর পলিমাটি বাংলার বস্তুজাত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। নিত্য ব্যবহার্য হাঁড়ি, পাতিল, বড়পাত্র, ঘটি-বাটি, বর্তন, শানকি, কলসি, শিশুদের জন্য পুতুল, পূজার জন্য মূর্তি, স্থাপত্য নির্মাণে ইট ও অলংকৃত

পোড়ামাটির ফলক, মাটির প্রদীপসহ আরো নানা রকমের গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনে নদীর পলি-কাদামাটি দিয়ে তৈরি করেছে, ব্যবহার করেছে। এসব উপাদান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের বৈরী প্রকৃতির কারণে ও কালের ব্যবধানে স্থাপত্য শিল্পে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বেশির ভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ের পূর্বের বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন, অথবা পোড়ামাটির অলংকৃত ইট ও ফলকের কোন নিদর্শনের চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে একাদশ শতকের সময়কালের বরেন্দ্র ও সমতট অঞ্চলের বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যে বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকে এ দেশের পোড়ামাটি শিল্পের প্রাচীনতম অপূর্ব নিদর্শনের প্রমাণ মেলে। এসবই আজকের পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধ-স্তূপ বা মন্দিরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। এসব মন্দির গাত্রে ব্যবহৃত অলংকৃত ফলকগুলোর শিল্পী বাংলার গ্রামের সাধারণ মৃৎশিল্পীরা। ফলকগুলোতে মৃৎশিল্পীরা গ্রামীণ জনজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পশু পাখির চিত্র, কাল্পনিক দৃশ্য, নরনারীর প্রেম, দেবদেবীর চিত্র তুলে ধরেছেন। মৃৎশিল্পীরা সাবলীলভাবে সরল দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে নকশা, চিত্র, পারিপার্শ্বিকতাকে ফলকে বিধৃত করেছে। মৃৎশিল্পীরা সাধারণতঃ উপরিতল থেকে (Base Relief) অবিক্ষিপ্তভাবে সৃষ্ট ভাস্কর্য তৈরি করেছেন পোড়ামাটির ফলকে। কৃষিজীবী বাংলার গণমানুষের জীবনের চিত্র ফলকগুলোতে স্থান পেয়েছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধস্তূপে ব্যবহৃত ফলকগুলো তৈরি হয়েছিল তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু শিল্পে প্রতিফলন ঘটেছে বাংলার গ্রামের চিরায়ত চিত্রের। মূলতঃ এসব ফলকের শিল্পী মৃৎশিল্পীরাই হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, শানকি, বর্তন, পুতুল ও মূর্তি তৈরি করতো। পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ের বৌদ্ধস্তূপের সংগে মৃৎপাত্রের নির্দশনও পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে সংগৃহীত বাংলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য, পোড়ামাটির অলংকৃত ইট ও ফলকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতির বৌদ্ধস্তূপেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে কালের ব্যবধানে এবং মুসলমানদের এদেশে আগমনের ফলে ইসলামী শিল্পকলার প্রভাবে এখানে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে, বিশেষ করে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এ সময়কালে এদেশে নির্মিত বহু মসজিদে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে নতুন মাত্রা যোগ হয়। অলংকরণ হয় আরো সূক্ষ্ম। মানুষ আর জীবজন্তুর ছবি স্বাভাবিক কারণে ইসলামের আদর্শ ও দর্শন অনুযায়ী বাদ পড়ে যায়। অলংকরণ, ছন্দ ও নকশার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এদেশের সেই আদি মৃৎশিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষের প্রযুক্তি ও দক্ষতার ছাপ রেখে গেছে। আজো উল্লিখিত সময়ের, বিশেষ করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সোনারগাঁও অঞ্চলের মসজিদগুলোতে পোড়ামাটির ফলকে বাংলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য শোভা পাচ্ছে। স্বাধীন সুলতানী আমলের পর মুঘল আমলের শেষার্ধ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে অসংখ্য। এসব মন্দির গাত্রে

পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ফলকে হিন্দু-পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনামূলক ছবির ভাস্কর্য কেন্দ্রিক শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এ ধরণের মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির। তবে এসব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে কেবল পৌরাণিক ধর্মীয় কাহিনীর ছবিই স্থান পায়নি বরং বাংলার লোকজ চিত্রের পরিচয় মৃৎশিল্পীরা দিতে সচেষ্ট হয়েছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধস্তুপের অনেক গ্রামীণ প্রাকৃতিক চিত্রের অনুরূপ চিত্র হিন্দু মন্দিরের ফলকেও দেখা গেছে। এখানে এই শিল্পের ঐতিহ্যের ধারার ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন মৃৎশিল্পীরা। এখনো বাংলার গ্রামগুলোতে মাটির জিনিসপত্র তৈরি হয়, তবে আগের মত নয়। মেশিনে তৈরি অভঙ্গুর এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল গ্রামে ব্যবহার শুরু হওয়ায় মাটির তৈরি জিনিস পত্রের ব্যবহারে ভাটা পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চল ভেদে মাটির তৈরি পাত্রেও নানা বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য। যে অলংকরণ করা হয় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব পাত্রের সংগে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবনাচার, সংস্কার, ধর্ম, অনুষ্ঠান সম্পর্কিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। মৃৎপাত্র ব্যবহারের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল ভেদে কিভাবে তারতম্য ঘটেছে তাও বিস্ময়ের দাবি রাখে। মৃৎপাত্রে অলঙ্ককরণ, রঙ এর ব্যবহার, মোটিফ সমূহের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতির পরিচয় ও লোক জীবনের পরিচয় মৃৎশিল্পী তার মৃৎপাত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন রাজশাহীর 'শখের হাঁড়ি'। শখের হাঁড়িতে ব্যবহৃত নকশায় প্রকৃতিকে লোকজ সংস্কারে রূপান্তরিত করেছেন মৃৎশিল্পী। বংশপরম্পরায় যে কৌশল ও দক্ষতা উত্তরাধিকার সূত্রে মৃৎশিল্পী পেয়েছেন এবং সেই সংগে আচার-আচরণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কার তা তার সৃষ্ট মৃৎপাত্রে তুলে ধরেছেন। ঠিক একইভাবে সাধারণ মৃৎপাত্রের ব্যবহার অনুযায়ী তার নামকরণ হয়েছে, যেমন ভাতের হাঁড়ি, তরকারির হাঁড়ি, দুধের হাঁড়ি, ডালের হাঁড়ি, মিষ্টির হাঁড়ি, দৈ এর হাঁড়ি, সন্দেশের হাঁড়ি, কাসন্দির হাঁড়ি, তেলের পাতিল, মাছ ধোয়ার হাঁড়ি, চাল ধোয়ার হাঁড়ি, মুড়ি, খই, চিড়া, মুড়কির হাঁড়ি। ধানের মটকা, মরিচের মটকা, কলসি, ইত্যাদি আরো কত নাম। অঞ্চল ভেদে এই নামেরও তারতম্য রয়েছে। গড়নেও তারতম্য রয়েছে। রয়েছে প্রযুক্তিগত সূক্ষ্ম তারতম্য। মাটির পুতুলও বাংলার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মা ছেলে, বাঘ, ছাগল, হরিণ, গরু, হাতী, পাখি, পুরুষ, মহিলা, শিশু ইত্যাদিকে টেপা পুতুল বলে। বাংলার সকল অঞ্চলেই মৃৎশিল্পীরা এসব তৈরি করেন। আঙুল আর কাঠি দিয়ে, মেয়েরা এবং শিশুরাও এসব পুতুল তৈরি করে। এসব পুতুলে বাংলার লোক-সমাজের সংস্কার বিধৃত। টোটেম, প্রাকৃত আদিম জীবনের নানা লক্ষণ এতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প এ দেশের লোকশিল্পের অন্তর্গত। এর শিল্পী বাংলার গ্রামের মৃৎশিল্পী। এই শিল্পে বিধৃত হয়েছে বাংলার লোক সংস্কৃতির সামগ্রিক চেহারা। আমাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ মৃৎশিল্পের গভীরে বিদ্যমান। উপযুক্ত পরিবেশে মৃৎশিল্পের গবেষণায় বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হতে পারে।

বাংলাদেশের চিত্রিত হাঁড়ি

লোক ও কারুশিল্প দৈনন্দিন প্রয়োজনের, উপযোগিতার, আমাদের যাপিত জীবনের-সংস্কৃতির অনুষঙ্গ, সাংস্কৃতিক উপাদান। আমাদের দেশের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রবহমান ধারা স্বনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষি-কারুশিল্প ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত। ফলে বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক লোকসমাজের সাধারণ মানুষের অনুভবে, চেতনায় জীবনের অঙ্গ হিসেবে লোক ও কারুশিল্প সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায়, নিয়মে সৃষ্টি, বিকশিত, রূপান্তরের ধারায় অব্যাহত, সক্রিয় রয়েছে। মানুষ জীবন যাপনের মতই লোক ও কারুশিল্পের ধারাকে সক্রিয় রাখতে সচেষ্ট এবং স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ধারাকে অব্যাহত রাখার মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পকে প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করে চলেছে।

সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লোক ও কারুশিল্প প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সহজাত, সক্রিয়। ফলে লোক ও কারুশিল্প সাধারণ জীবনের অভ্যাসের, রুচির, বৈশিষ্ট্যের এবং গোষ্ঠীর পরিচায়ক। জাতীয় জীবনে জাতিতাত্ত্বিক মর্যাদার, গৌরবের বলে পরিগণিত হয়েছে। সংস্কৃতির পরিচয়ের বলে তা মানুষের জীবনাচারণের অন্তর্ভূক্ত-জীবনঘনিষ্ঠ। জীবনের, সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার গুণে, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল লোক কারুশিল্প প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের দাবি রাখে।

মানুষ যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক, সেহেতু অনুভব ও চেতনায় প্রয়োজন এবং উপযোগিতার নিরিখে লোক ও কারুশিল্পের চিত্রকল্প গড়ে। চিত্রকল্প রূপলাভ করে লোক ও কারুশিল্পের নানা সৃষ্টিতে। একদিকে লোক ও কারুশিল্প যেমন প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটায় অপরদিকে অনুভব ও চেতনার জগতে সৌন্দর্যের আনন্দ বিকশিত হয়। সৌন্দর্যের পরিবেশ, সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় লোক ও কারুশিল্পে। প্রয়োজন ও সৌন্দর্য যুগপৎ লোক ও কারুশিল্পে ক্রিয়াশীল। প্রয়োজনের জন্য লোক ও কারুশিল্পের উদ্ভাবন, গড়া হলেও এতে সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির আলেখ্য সম্পৃক্ত।

কারুশিল্প সৃষ্টিতে প্রয়োজনের নিরিখে এর গড়ন, আকার অবয়ব নির্দষ্ট হয়। এতে সমন্বয়পূর্ণ, সদৃশরূপ বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে লোক ও কারুশিল্প ছন্দময়, রূপময়, বর্ণাঢ্য-সৌন্দর্যগুণের হয়। অনুভব ও চেতনার মনোজগত কারুশিল্পীর মধ্যে কারুশিল্পের

সৌন্দর্যের, গড়ণের নিখুত বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করতে সহায়তা করে, অনুপ্রেরণা দেয়। পটভূমি, ভিত্তি, প্রেক্ষিৎ থাকে দেশ, প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ, মানুষের যাপিত জীবনের প্রবহমান ধারা, সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে কারুশিল্পীর বংশ পরম্পরায়ের কৌশল ও দক্ষতায় সৃষ্টি হয় লোক ও কারুশিল্প। ফলে লোক ও কারুশিল্প নিছক আধুনিক ক্রাফট, হাতের কাজ, হস্তশিল্প এই পদবাচ্য না হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বলে বিবেচিত হয়। কোন নির্দৃষ্ট অঞ্চলের, জনপদের, নৃগোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর, উপজাতির, জাতির সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে লোক ও কারুশিল্প। অঞ্চল ভেদে, নানা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়কে সনাক্ত করায়। লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ, বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বৈশিষ্ট্যের নামে, রূপে ও গড়নে প্রতিষ্ঠা পায়।

সাধারণ মানুষের জীবনাচারণ সংস্কৃতির অভ্যন্তরস্থ বস্তু, আধেয়। সাধারণ মানুষের জীবনাচারণের ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিক রূপের পরিচয়বাহী সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতি ধারণ করে। এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে লোক ও কারুশিল্পে সাধারণ মানুষের জীবনাচারণের ক্রমপুঞ্জিত রূপকে, সংস্কৃতিকে পরিলক্ষিত করি। সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত, বজায় থাকে রুপান্তরের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায়। অনুরূপ প্রক্রিয়ায়, পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক উপাদান-লোক ও কারুশিল্প কালিক ব্যবধানে সাধারণ মানুষের রুচি, চাহিদার ভিত্তিতে ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের নিরিখে প্রতিনিয়ত রূপান্তরের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়ে চলেছে। লোক ও কারুশিল্পের রূপান্তরের ধারায় পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া সূচিত হয় বহুমাত্রিক লক্ষ্যে। লোক ও কারুশিল্প বস্তুজাত সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট। কেবল উপযোগিতা, প্রয়োজনের সাদামাটা, সাধারণ লোক ও কারুশিল্প থেকে সৌন্দর্যের, সুষম ও সুগঠিত, বর্ণাঢ্য, চিত্রগুণ সম্পন্ন লোক ও কারুশিল্পে পরিণত হওয়া রূপান্তরের বহু ধারায় পথ পরিক্রমা মাত্র। বস্তুজাতসংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বস্তু, জিনিসের মৌলিক আকার, গড়ণ সময়ের ব্যবধানে সৌন্দর্যের, রূপের রংএর, নকশার, সুষমার লোক ও কারুশিল্পে পরিণত হয়ে থাকে। ক্রমশঃ লোকশিল্পীর কৌশল ও দক্ষতায় এতে প্লাষ্টিক ও প্রাফিকগুণের সমাহার, সমন্বয় ঘটেছে। চিত্র, খোদাই, প্রতিসমগুণসম্পন্ন হয়েছে। এভাবে নানা ধারায়, প্রক্রিয়ায় লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির, কৌশলের ও দক্ষতার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কারুশিল্পী কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে লোকসমাজের সাধারণ মানুষের রুচি, চাহিদার প্রেক্ষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পকে চলমান রাখেন। ফলে লোক ও কারুশিল্প কখনো উপযোগিতার, কখনো সৌন্দর্যের, আচার-আচরণের। এবং প্রতিনিয়ত লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের বহুমাত্রিকতার গুণ, বৈশিষ্ট্য একে চলমান, অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পও এ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের আদি নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপনকেন্দ্রিক বস্তুজাত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে রূপলাভ করেছে। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদি নৃগোষ্ঠী ও পরবর্তীতে আগত

অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মিলিত ও সমন্বিত জীবনযাপনকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সংস্কৃতি-বস্তুজাতসংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহ করে। বিকশিত হয়। একটি ভিত্তি তৈরি হয়।

বস্তুজাত সংস্কৃতির পরিচায়ক এদেশের প্রকৃতি পরিবেশের কাঁচামাল উপকরণ মাটি, বাঁশ-বেত, কাঠ, তন্তুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহার্য অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস। যেমন (১) মাটিঃ হাঁড়ি, পাতিল, কলসী, সানকী, বাটি, সরা, প্রদীপ (২) বাঁশ, বেত, শন, খড়ঃ শনের ঘর, বাঁশের ঘর, মাথাল, ঢুলা, কুলা, চালনি, খালই, ধামা, পলো, চাই (৩) কাঠঃ নৌকা, ঢেকী, বাক্স, দরজা, ঘরের খুটি, চৌকাঠ, লাঙ্গল (৪) তন্তুঃ কাপড়। প্রাত্যহিক জীবনের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য এসব জিনিস বস্তুজাত, একান্তই বাংলাদেশের সংস্কৃতির অনুষঙ্গ-বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। এদেশের বৈশিষ্ট্যের গড়ণ এসব জিনিসে, বস্তুতে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কালিক ব্যবধানে উল্লিখিত বস্তুজাত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ক্রমান্বয়ে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষিতে রূপান্তরের ধারায় সুষমার, সৌন্দর্যের চিত্র, খোদাই এবং নকশাগুণের লোক ও কারুশিল্প পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। বস্তুজাতসংস্কৃতির জিনিস, পণ্য কালভেদে, স্থানভেদে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রূপান্তরিত হয়ে সনাক্ত হয়েছে লোক সমাজের শিল্পকলা-লোক ও কারুশিল্প হিসেবে। বস্তুজাতসংস্কৃতির সকল আধেয়গুণ, বৈশিষ্ট্যে আরোপিত হয়েছে কারুশিল্পীর কৌশল, দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধ। ফলে লোক ও কারুশিল্প জাতিতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক। সবসময় সকল কালে, স্থানে এই পরিচয় বহন করে চলেছে। লোক ও কারুশিল্প সকল সময়ে কোন সংস্কৃতির, জাতির, গোত্রের।

মুলতঃ বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মৌলিকত্ব, স্বাতন্ত্র্য এদেশের লোক ও কারুশিল্প ধারণ করে আছে। এদেশের মৃৎশিল্প বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির নিরিখে, বৈশিষ্ট্যে রূপলাভ, বিকশিত হয়েছে। বস্তুজাতসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত মৃৎশিল্প দৈনন্দিন উপযোগিতা, প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভব, সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার উত্তরাধিকারী আজকের বাংলাদেশের বৃহত্তম অংশ গ্রামের লোকজীবনের সাধারণ মানুষ মৃৎশিল্পকে চলমান, অব্যাহত রেখেছে।এবং আজকের মৃৎশিল্প-মৃৎপাত্রের ধারা প্রাচীন ধারারই অব্যাহতরূপ। এ প্রসংগে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য "পোড়ামাটির নানা প্রকারের থালা বাটি, জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বজ্রযোগিনীর সন্নিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুরায় ময়নামতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক ও বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সাখ্য বহন করিতেছে"।[১] অর্থাৎ সাভার, ময়নামতি, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর মহাস্থান বা পুন্ড্র অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন লাল এবং ধুসর শ্রেণীর[২] মৃৎপাত্রের অব্যাহত ধারা আজকের বাংলাদেশের মৃৎপাত্র।

বস্তুজাত সংস্কৃতির জিনিস-মৃৎপাত্র প্রয়োজনের সেই সংগে সৌন্দর্যের, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের পরিণত হয়েছে। সনাক্ত হয়েছে লোক ও কারুশিল্পের বলে। স্থানিক

ও কালিক ব্যবধানে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে সাধারণ মৃৎপাত্র পরিণত হয় সৌন্দর্যের, চিত্র, ও নকশাগুণ সম্পন্ন বর্ণাঢ্য লোক ও কারুশিল্পে।[৩]

বাংলাদেশেও মৃৎপাত্রের মধ্যে হাঁড়ি সাধারণ গৃহস্থালীর প্রয়োজন থেকে সৌন্দর্যের, সুষমার, চিত্রগুণ সম্পন্ন চিত্রিত হাঁড়িতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত দুই শ্রেণীর হাঁড়ি বাংলাদেশে পাওয়া যায়। (১) রান্না বান্নারকাজে, গৃহস্থালী প্রয়োজনে ব্যবহার্য নানা গড়ণ, মাপের, সাধারণ বড়, মাঝারি ও ছোট হাঁড়ি। (২) চিত্রিত হাঁড়ি। উৎসব, পাল-পার্বন-পূজা উপলক্ষে লোকমেলায় চিত্রিতহাঁড়ির পসরা বসে। এছাড়া বিয়ে ও অন্যান্য লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে মিষ্টি, পিঠাসহ চিত্রিতহাঁড়ি গ্রামে আত্মীয়, কুটুম্বের বাড়ীতে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। সাম্প্রতিককালে এই চিত্রিত হাঁড়ির ব্যবহারে আরো বৈচিত্র এসেছে যেমন এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তোরণ নির্মাণে ব্যবহার হয়। এবং শহরে নগরে বাড়ীঘরের বৈঠকখানায় চিত্রিত হাঁড়ি সংস্কৃতির পরিচায়ক, অহংকারের, গৌরবের বস্তু হিসেবে স্থান দখল করে নিচ্ছে।

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের চিত্রিত হাঁড়ির নাম, গড়ণ, নকশা, চিত্রগুণ এবং সৌন্দর্যে বিভিন্নতা, পার্থক্য লক্ষণীয়। এই চিত্রিত হাঁড়ির নাম কোথাও রঙ্গের হাঁড়ি, কোথাও শখের হাঁড়ি নামে পরিচিত। তবে বাংলাদেশে এই চিত্রিত হাঁড়ির অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও রাজশাহী অঞ্চলের শখের হাঁড়ির নাম বিশেষ জনপ্রিয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ চিত্রিত হাঁড়ি তৈরি হয় এবং সেখানেও চিত্রিত হাঁড়ির নাম "শখের হাঁড়ি" বলে পরিচিত। (১) M. K. Pal, (1978;177) [৪] (2) Kamaladevi Chattopadhyay, (1975;134).[৫]

বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলেই চিত্রিত হাঁড়ি পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলো হচ্ছে, রাজশাহীর সিন্দুরকুসুম্বী, বায়া, হরগ্রাম, বসন্তপুর,চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার বারোঘরিয়া গ্রাম, ঝিনাইগতি থানা, ঢাকার নয়ারহাট, কুমিল্লা, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, ফরিদপুরের কোয়েলজুড়ি ও হাসরা, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, জামালপুরের বজরাপুর, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু থানার ইদিলপুর, ময়মনসিংহের বালাসুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের চিত্রিত হাঁড়ির নাম, গড়ণ, নকশা, মোটিফ, চিত্রগুণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিভিন্নতা, পার্থক্য লক্ষণীয়। হাঁড়ির গড়নে অঞ্চলভেদে বৈচিত্র উল্লেখ করার মত, যেমন কোন অঞ্চলে চিত্রিত হাঁড়িতে ঢাকনা আছে কোথাও ঢাকনা নেই, আবার কোন অঞ্চলে চিত্রিত হাঁড়িতে হাতল রয়েছে। চিত্রে রং ও মোটিফের ব্যবহার রীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যেমন রাজশাহীর পবা থানার বসন্তপুরের শখের হাঁড়িতে ব্যবহৃত মোটিফ, হাতী, ঘোড়া, পাখি, মাছ, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বিভিন্ন ধরনের ফুল, নকশী লতাপাতা, শাপলাফুল, প্যাঁচা, কবুতর, চড়ুই পাখি, ইত্যাদি। গোয়ালন্দের শখের হাঁড়ির মোটিফ ইলিশ মাছ, শাপলা ফুল, পান লতা। রাজবাড়ীর শখের হাঁড়ির মোটিফ নকশী লতাপাতা ফুল।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের এক অমূল্য সম্পদ চিত্রিত হাঁড়ি ধারণ করে আছে আবহমান বাংলার লোক সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম-বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসব। আবহমান বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামীণ মানুষ হ'লো এদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর সংগে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে আগত নৃগোষ্ঠীসমূহের সম্মিলনে সমন্বিত জীবনযাপনের প্রবহমান এবং ক্রমপুঞ্জিত ধারায় কালিক ব্যবধানে সৃষ্ট রূপান্তরিত রূপ। ফলে লোকজীবনের সৃষ্টি লোক ও কারুশিল্প জাতিতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক। এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কেবল সৌন্দর্যতত্ত্ব , শিল্পকলার ইতিহাসের দৃষ্টিতে, প্রেক্ষিতে এবং বর্ণনামূলক হওয়া যথেষ্ট নয়। লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতায়-জাতিতাত্ত্বিক নিরিখে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসংগে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত চিত্রিত হাঁড়ির গবেষণা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন জাতিতাত্ত্বিক নিরিখে হওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত।[৬] এ প্রসংগে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ হ্যাজেল বার্জারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 'One can never make a detailed study of a work of art without determining its place in the total structure of the culture as well as in historical style sequence".[৭]

লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে হ্যাজেল বার্জারের গবেষণাধারা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে এর প্রয়োগের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত বহুমাত্রিক ও সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাপক, বিস্তৃত অনুধাবন সম্ভব। হ্যাজেল বার্জারের গবেষণা ধারা, পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নলিখিত ধারায় লোক ও কারুশিল্পের গবেষণা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(১) নির্দিষ্ট লোক ও কারুশিল্পের বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

(২) লোক ও কারুশিল্পের ব্যক্তি শিল্পী, কারিগরের জীবন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত চিত্রিত হাঁড়ির গবেষণা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে উপরোক্ত দুটি পদ্ধতি ও ধারায় সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই গবেষণা পদ্ধতি ও ধারায় বাংলাদেশের লোকজীবনের মানুষের জীবনযাপনসম্বন্ধীয়-সংস্কৃতিবিষয়ক লোক ও কারুশিল্প চিত্রিত হাঁড়ির জাতিতাত্ত্বিক নিরিখে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বিজ্ঞানসম্মত, সার্বিক ও বহুমাত্রিকগুণ সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রিত হাঁড়ির স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে, এর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদঘাটনে এবং দেশের সংস্কৃতির রূপ অন্বেষণে লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এক নতুন দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য নির্দেশ

১. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, বাং ১৩৫৯ ঃ ১৮৩।

২. Ahmed Tofayel, Ameen Shafiqul, Matin Sarker Abdul and Sydur Muhammad, 1982 "Popular art in Bangladesh", UNESCO, Paris Cultures, Vill-1, 7982 :127

৩. Chattopadhyay Kamaladevi, Handicrafts of India, Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, 1975 :137.

৪. Pal M. K. Crafts and Craftsmen in Traditional India, 1978 : 177.

৫. Chattopadhyay Kamaladevi, Handicrafts of India, Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, 1975 : 134.

৬. সৈয়দ মাহবুব আলম, "লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ ঃ প্রসংগ নকশী কাঁথা", বাংলাদেশের লোকশিল্প, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ, ১৯৮৩ ঃ ১৪৬।

৭. Haselberger, Herta, 1961, "Method of studying Ethnological Art" Current Anthropology 2:341-384.

রাজশাহীর শখের হাঁড়ির একজন শিল্পী

এদেশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মিত এবং এর বৈশিষ্ট্য সনাক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানকে ব্যবহার করে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের কল্পলোক ও বস্তুগত রূপের ধারণা। কল্পলোক দিয়েছে লোক সাহিত্য, লোক সংগীত, লোকনৃত্য, লোকবিশ্বাস এবং বস্তুগত রূপ হিসেবে পেয়েছি নানা বস্তু, গড়ণ ও জিনিস।

মুলতঃ মানুষের তৈরি বস্তুর সংগে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানুষের স্বভাব, আচরণের এবং জীবনধারা-সংস্কৃতির সংযুক্তি সাধনের বিশেষগুণ, বৈশিষ্ট্য বস্তুজাত সংস্কৃতিতে, বস্তুসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত বস্তুতে বিদ্যমান ও সক্রিয়। প্রকৃতির কাঁচামাল, উপকরণ দিয়ে দক্ষ, নিপুন হাতের পরিচালনায় ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত কৌশল প্রয়োগ করে বস্তু তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরনের বা শ্রেণীর বস্তুর সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক উপকরণের গুণ, বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল। আমাদের দেশেও প্রকৃতির প্রাকৃতিক উপকরণের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বস্তুসৃষ্টিতে ঐতিহ্যিক লোকজীবনধারাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট উপযোগী বলে গণ্য এবং লোকসমাজে সকলের গ্রহণযোগ্য, যথাযথভাবে স্থিরকৃত নির্ধারিত গড়ণ সম্বলিত নমুনাসমূহকে অনুসরণ করা হয়। বস্তুর আকার ও গড়ণে কিছু অতিরিক্ত গুণ, বৈশিষ্ট্য যোগ হয় যা কারুশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপযোগিতারগুণ ছাড়াও সম্ভবতঃ নকশায় সূক্ষ্মতা, প্রতিসমগুণ, গড়নে পরিমার্জনার গুণ যুক্ত হয়। এবং বস্তু-কারুশিল্পের গড়নের আকর্ষণীয় দিক ও এতে কায়িক পরিশ্রম, কৌশল ও চেষ্টার প্রকাশের মহিমা স্পষ্ট, দৃশ্যমান।

মানুষ তার অনুভূতির জগতের অস্থিরচিত্ত অবস্থা, কৌতুহল, এবং বৈচিত্রের স্বাদের আকর্ষণ, এই মনোভাব কোন বস্তু, জিনিস-কারুশিল্প তৈরিতে আরোপ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়িয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত অনুভব, সংস্কার, আচার মানুষকে তাড়িত করে। এ প্রসংগে বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনের গড়নে ও সম্পূর্ণতার বাহ্যরূপ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক লুই বলছেন যে, বস্তু কারুশিল্প সরাসরি উপযোগিতার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। অর্থাৎ বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে উপযোগিতার গুণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আছে অসাধারণ বাড়তি মাত্রার প্রতিসমগুণ, সুরুচি সম্পন্ন, সুন্দর, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলের পরত।

মুলতঃ লোককারুশিল্প মানুষের জীবনযাপনের উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুষংগ। বস্তু, লোককারুশিল্পের বাহ্যিক রূপে ও গড়নে প্রাকৃতিক পরিবেশের ও মানুষের লোকজীবনধারার বৈশিষ্ট্য যুগপৎ ক্রিয়াশীল। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে মানুষের কৌশল ও দক্ষতার গুণ এবং সৌন্দর্য, ছন্দ ও নকশাগুণ। বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, নৃগোষ্ঠীর ভিন্নতা বিচিত্র ধরনের বৈশিষ্ট্যের বস্তুসংস্কৃতি– বস্তুজাত সংস্কৃতিসংশ্লিষ্ট বস্তু-লোককারুশিল্পের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। লোককারুশিল্প যেহেতু লোকজীবনের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সৃষ্ট একটি সাংস্কৃতিকপরিবেশের অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু লোককারুশিল্প গ্রামীণমানুষের জীবনযাপন ও কাজকর্মকেন্দ্রিক। যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় এদেশের মানুষকে তার জীবনযাপনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে অনিবার্যভাবে কৃষিকাজ, মাছধরা, মাটির হাড়িপাতিল তৈরি করা, নৌকা বানানো, বাঁশ-বেতের কাজ, সুতার তাঁত বোনার কাজকে বেছে নিতে হয়েছিল। এবং এসব কাজ করতে গিয়ে বৈশিষ্ট্যের বস্তু, লোক কারুশিল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছিল এদেশের মানুষ। এভাবেই এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ অনুভব ও চেতনায় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণ-কাঁচামাল, কৌশল-প্রযুক্তি, দক্ষতা দিয়ে বস্তুজাত সংস্কৃতি গড়েছে এবং অনিবার্যভাবে বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-লোক কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে।

মৌসুমীবায়ু, বর্ষা, বৃষ্টি, নদ-নদী, খাল বিল, সবুজ শস্য ক্ষেতের দেশ বাংলাদেশ। আদি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যা আজকের পদ্মা, মেঘনা, যমুনার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাংলার মানচিত্র জুড়ে শোভা পাচ্ছে। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষ এই অসংখ্য নদীকেন্দ্রিক সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করছে। নদীর দুই তীরে শহর, বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ ও নতুন জনপদ রয়েছে। নদীর পলিমাটি বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

নিত্যব্যবহার্য হাঁড়ি, পাতিল, ঘটি-বাটি, শানকি, কলসি, পোড়ামটির পুতুল, মাটির মূর্তি, অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক, মাটির প্রদীপ ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ তার জীবনযাপনের প্রয়োজনে নদীর পলি কাদামটি দিয়ে তৈরি করছে। ব্যবহার করছে। এখনো বাংলার গ্রামগুলোতে মাটির জিনিসপত্র তৈরি হয়, তবে আগের মত নয়। মেশিনে তৈরি অভঙ্গুর এলুমিনিয়ামের হাড়ি, পাতিল গ্রামে ব্যবহার শুরু হওয়ায় মাটির জিনিসপত্রের ব্যবহারে ভাটা পড়েছে। তবে এর ধারা এখনো রয়েছে। ক্রমশঃ এধারা ক্ষীণ হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলভেদে মাটির তৈরি পাত্রেও নানা বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য গড়নে, অলংকরণে ও আকারে লক্ষণীয়। এসব পাত্রের সঙ্গে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচার, সংস্কার, ধর্ম, অনুষ্ঠান, উৎসব সম্পর্কিত। মৃৎপাত্রে অলংকরণ, রংএর ব্যবহার,

মোটিফসমূহের উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলার প্রকৃতির ও লোকজীবনের পরিচয় মৃৎশিল্পী তার তৈরি মৃৎপাত্রে ফুটিয়ে তোলে। যেমন রাজশাহীর শখের হাড়ি। শখের হাড়িতে ব্যবহৃত নকশায় প্রকৃতিকে লোকজীবনের লোক সংস্কারে রূপান্তরিত করেছে মৃৎশিল্পী।

বস্তুজাতসংস্কৃতির জিনিস-মৃৎপাত্র প্রয়োজনের সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের, এবং বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের পরিণত হয়েছে। সনাক্ত হয়েছে লোক ও কারুশিল্পের বলে। স্থানিক ও কালিক ব্যাবধানে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সাধারণ মৃৎপাত্র পরিণত হয় সৌন্দর্যের, চিত্র ও নকশাগুণ সম্পন্ন বর্ণাঢ্য লোক ও কারুশিল্পে। এ প্রসংগে শ্রীমতি কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বের দাবিরাখে। "Water pots took on pleasing shapes and alluring designs came to cover the mundane kitchenpans. Here we see the transformation of mere functional into works of art, the common becoming cherished"[১]

বাংলাদেশেও মৃৎপাত্রের মধ্যে হাঁড়ি সাধারণ গৃহস্থালীর প্রয়োজন থেকে সৌন্দর্যের, সুষমার, চিত্রগুণসম্পন্ন চিত্রিত হাঁড়িতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত দুই শ্রেণীর হাঁড়ি বাংলাদেশে পাওয়া যায়। (১) রান্নবান্নার কাজে গৃহস্থালী প্রয়োজনে ব্যবহার্য নানা গড়ন, মাপের সাধারণ বড়, মাঝারি ও ছোট হাঁড়ি। (২) চিত্রিত হাঁড়ি। পাল-পার্বন -পূজা উপলক্ষে লোক মেলায় বিচিত্র হাঁড়ির পসরা বসে। এছাড়া বিয়ে ও অন্যান্য লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে মিষ্টি, পিঠাসহ চিত্রিত হাঁড়ি গ্রামে আত্মীয়, কুটুম্বের বাড়িতে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। এবং সর্বপরি বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের পল্লীগৃহে ঝুলানো নকশী পাটের সিকায় এই চিত্রিত হাঁড়ি শোভা পায়। সাম্প্রতিককালে এই চিত্রিত হাঁড়ির ব্যবহারে আরো বৈচিত্র এসেছে যেমন এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তোরণ নির্মাণে ব্যবহার হয়। এবং শহরে, নগরে বাড়িঘরের বৈঠকখানায় চিত্রিতহাঁড়ি সংস্কৃতির পরিচায়ক, অহংকারের, গৌরবের বস্তু হিসেবে স্থান দখল করে নিচ্ছে। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের চিত্রিতহাঁড়ির নাম, গড়ণ, নকশা, মটিফ চিত্রগুণ ও সৌন্দর্যে বিভিন্নতা ও পার্থক্য লক্ষণীয়। এ চিত্রিত হাঁড়ির নাম কোথাও রঙ্গের হাঁড়ি, কোথাও শখের হাঁড়ি নামে পরিচিত। তবে বাংলাদেশে এই চিত্রিত হাঁড়ির অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও রাজশাহী অঞ্চলের শখের হাঁড়ির নাম বিশেষ জনপ্রিয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ চিত্রিত হাঁড়ি তৈরি হয় এবং সেখানেও চিত্রিত হাঁড়ির নাম "শখের হাঁড়ি" বলে পরিচিত। (1) M. K. Pal, (1978; 177)[২] (2) Kamaladevi Chattopadhay, (1975: 134)[৩]

বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলেই চিত্রিত হাঁড়ি পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলো হচ্ছে রাজশাহীর সিন্দুরকুসুম্বী, বায়া, হরগ্রাম, বসন্তপুর, চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার বারোঘরিয়া গ্রাম, ঝিনাইগাতি থানা, ঢাকার নয়ারহাট, কুমিল্লা, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, ফরিদপুরের কোয়েলজুড়ি ও হাসরা, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, জামালপুরের

বজরাপুর, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার ইদিলপুর, ময়মনসিংহের বালাসুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের চিত্রিত হাঁড়ির নাম, গড়ণ, নকশা, মটিফ, চিত্রগুণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিভিন্নতা, পার্থক্য লক্ষণীয়। হাঁড়ির গড়নে অঞ্চলভেদে বৈচিত্র উল্লেখ করার মত, যেমন কোন অঞ্চলে চিত্রিত হাঁড়িতে ঢাকনা আছে, কোথাও ঢাকনা নেই, আবার কোন অঞ্চলে চিত্রিত হাঁড়িতে হাতল রয়েছে। চিত্রে রং ও মোটিফের ব্যবহার রীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যেমন রাজশাহীর পবা থানার বসন্তপুরের শখের হাঁড়িতে ব্যবহৃত মোটিফ, হাতী, ঘোড়া, পাখি, মাছ, রাজহাঁস,পাতিহাঁস,বিভিন্ন ধরনের ফুল, নকশী লতাপাতা, শাপলাফুল, প্যাঁচা, কবুতর, চড়ুই পাখি, ইত্যাদি। গোয়ালন্দের শখের হাঁড়ির মোটিফ ইলিশ মাছ, শাপলা ফুল, পান লতা। রাজবাড়ীর শখের হাড়ির মোটিফ নকশী লতাপাতা, ফুল।

"শখের হাঁড়ি" এই নামের চিত্রিত হাঁড়ি বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের। সেজন্য বর্তমানে এর সাধারণ নাম রাজশাহীর শখের হাঁড়ি। একটি স্থানিক নাম যুক্ত হয়েছে। রাজশাহী জেলার কয়েকটি অঞ্চল যেমন সিন্দুর কুসুম্বী, বায়া, হরগ্রাম বসন্তপুর এবং চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার বারোঘরিয়া গ্রাম, এসব এলাকা শখের হাঁড়ি তৈরির এলাকা। তবে বর্তমানে সর্বত্র আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে লোককারুশিল্পের চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে। আগের মত শখের হাঁড়ি হাটে, মেলায়, পূজায় বা উৎসবে ব্যাপক কেনা বেচা হয় না। ফলে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির শিল্পী পরিবারের সদস্যরা তাদের পিতৃপুরুষের শৈল্পিক পেশা শখেরহাঁড়ি সৃষ্টির পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্যান্য পেশার দিকে ঝুকছে। আর্থ-সামাজিক কারণে তারা তাদের মূল আবাস এলাকা থেকে জমি বিক্রি করে অন্য নতুন এলাকায় বসতি স্থাপন করে নতুন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। ফলে শখের হাঁড়ি তৈরির শিল্পী পরিবার এখন একেবারেই কমে গেছে। যেখানে রাজশাহী অঞ্চলে (চাপাই নওয়াবগঞ্জসহ) একসময়ে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ ঘর শখের হাঁড়ি তৈরি করত, তা এখন ১০ থেকে ১৫ ঘর কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছে। এই ১০ থেকে ১৫ ঘরের মধ্যেও ২ থেকে ৩ ঘর স্বাভাবিক পর্যায়ে কাজ করে। অন্যরা তার চেয়েও কম। রাজশাহীর শখের হাঁড়ি বাংলার লোককারুশিল্পের ঐতিহ্য। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদানও বটে। বাংলাদেশের লোক কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত রাজশাহীর শখের হাঁড়ি যেমন বর্ণাঢ্য চিত্র ও নকশাগুণ সম্পন্ন তেমনি বৈশিষ্ট্যের গড়নে সমৃদ্ধ। রাজশাহীর শখের হাঁড়ি প্রসংগে এই প্রবন্ধে লোক কারুশিল্পের ব্যক্তি শিল্পী, কারিগরের জীবন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যের এই লোকশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এভাবে লোকসমাজের জীবনধারার পরিচয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, এবং শিল্পী ও কারিগরের ব্যক্তি মানসিকতা, লোকসমাজে শিল্পীর অবস্থান এবং শিল্পীর অনুভব ও চেতনাকে আবিস্কার করা সম্ভব হবে।

রাজশাহীর শখের হাঁড়ির শিল্পী সুশান্ত কুমার পাল, তার পিতার নাম মৃত ভোলানাথ কুমার পাল, এদের মূল বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জের প্রেমতলীতে। এক পুরুষ আগে তার পিতা জমিজমা বিক্রি করে বর্তমান শ্বশুরালয় বসন্তপুর চলে আসে এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য কিছু পাল পরিবারও চলে আসে। অর্থাৎ এক সময়ে যে প্রেমতলীতে তাদের স্থায়ী বাসছিল, সেই প্রেমতলী পদ্মা নদীর পাড়ে জনপদ নিয়ে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। প্রেমতলীতে তাদেরসহ প্রায় শখানেক পরিবার ছিল এবং তারা প্রত্যেকেই শখেরহাঁড়ি তৈরি করতে পারতো। পাশ্ববর্তী তানোর থানার কামারগাঁও মেলা, খেতরের মেলা, গোদাগাড়ী, প্রেমতলীসহ বিভিন্ন মেলা ও হাটে, উৎসব এবং পার্বনে, পূজার সময় শখের হাঁড়ি দেদার বেচাকেনা হতো বলে সুশান্ত জানালেন। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতই ভাল ছেল যে, তাদের জমি জমার পরিমাণ প্রায় ৭০/৮০ বিঘার মত। বাড়ীতে বড় ধরনের পূজোর আয়োজন হতো, নৌকার বহর ছিল। একান্নবর্তী পরিবারে পূজো ছাড়াও সকল আনন্দ উৎসব পালন করা হতো। গত পঞ্চাশ বছরে শখের হাঁড়ির চাহিদা ক্রমাগত কমতির দিকে থাকায় পূজো পার্বনে এবং হাটগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে শখের হাঁড়ির চাহিদা কম হয়ে যাচ্ছে। গত বিশ বৎসরে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে এবং শখের হাঁড়ির বিক্রি নিম্নতম পর্যায়ে চলে গেছে বলে সুশান্তর কথা থেকে জানা যায়। সুশান্ত জানালেন তার পিতাজীবিত থাকতেই শখের হাঁড়ির ব্যবসায়িক মন্দার প্রেক্ষিতে এবং তার পিতার সংসারের প্রতি অবহেলার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তাদের প্রেমতলীর জমিজমা হাতছাড়া হয়ে যায়। এবং তার পিতার শ্বশুরালয়ে বসন্তপুরে এসে বসবাস শুরু করে গত ৫০বৎসর পূর্বেই। বর্তমানে এই বসন্তপুরে তারা প্রায় ৩০ ঘর পাল একসঙ্গে বসবাস করে। প্রত্যেক ঘরের নারী পুরুষরা শখের হাঁড়ি বানাতে পারে, তবে চাহিদা কমে যাওয়ায় এই কাজ সচরাচর করে না। একমাত্র সুশান্তই শখের হাঁড়ি তৈরি অব্যহত রেখেছে এবং পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি স্মৃতি চারণ করতে যেয়ে বললেন "শৈশবে আমি কামারগাঁও মেলায় একবার দাদুর সঙ্গে (নানা) যাই। সেই সময় দেখি নৌকায় শুধু -- শখের হাঁড়ি আর হাঁড়ি। এত হাঁড়ি আমি জীবনে দেখিনি, হাটে যাওয়ার আগেই নৌকাতেই হাঁড়িগুলো সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে"। পাশাপাশি আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বললেন "রাজশাহীতে গত '৯৭ সালের পর্যটন মেলায় আমি একটি ভারে করে নিজেই কাঁধে করে প্রায় ৫০টির মত শখের হাঁড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। তিন দিন মেলার পর দেখা গেল একটি হাঁড়িও বিক্রি হয়নি।"এই দুটি স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। মন্তব্যে আরো বললেন "আমাদের আর ভবিষ্যৎ নাই। শখের হাঁড়ি তৈরি করে পেটের ভাত জুটবে না। যদি কেউ নাই কিনে তবে আমরা কেন বানাবো। ধীরে ধীরে গ্রামে রাস্তা ঘাট হচ্ছে, বিদ্যুৎ আসছে। প্লাষ্টিকের বিভিন্ন খেলনা আসছে, পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য শখের হাঁড়ির প্রয়োজনীয়তাও কমে গেছে। কারণ সেই গ্রাম নেই, গ্রামের সেই আসল মানুষ নেই। গ্রামের পূজা পার্বন, উৎসব আর আগের মত হয় না"।

সুশান্ত জানালেন "আমি আমার পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য থেকে কাজটি জানতাম, তবে এই কাজে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও দক্ষতা অর্জন করেছি আমার দাদু (নানা) মৃত বন্যেশ্বর পালের কাছ থেকে। আমার দাদু বিখ্যাত শখের হাঁড়ির শিল্পী ছিলেন, তিনি পাকিস্তান আমলে পুরস্কার পেয়েছেন। ওর কাছেই আমি ম্যানুষ, ওর কাছেই আমার শিক্ষা, যখন থেকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, তখন থেকেই। দাদুর কাছে থেকে কাজ শিখেছি। দাদু আমাকে খুব ভাল বাসতেন। আমার মা অক্ষম ছিলেন। দাদু বেঁচে থাকতেই তার দুটি ছেলে (হিরেন ও গিরেন) মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে দাদু অচল হয়ে গেলে আমার কাছ থেকেই সে মুখে আগুন পেয়েছে। তার বউ মানে আমার দিদিমা (বিমলা বালা পাল) এখনও বেঁচে আছেন, আমার কাছেই থাকেন। তিনিও সেই কাজ করতেন। দাদুর শ্বশুর বাড়ি ছিল সেন্দুকুশমী, বায়ার কাছে বায়া নদীর ধারে। ওখানে এখন কেউ নাই"।

সুশান্ত বললেন "আগে গুড়ের, হাড়ি , কলসী, হাঁড়ি, গুড়মটা তাওয়া, শখের হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার পাতিল, ছাচের পুতুল, পাখি, রুটি ভাজার খোলা ইত্যাদি তৈরি করতাম"। "এর মধ্যে মহিলারা আঠাল গোটা দিয়ে পিটনা দিয়ে খুচরা মাল তৈরি করতো। যেমন রুটিভাজা খোলা, তুসকা, তরকারীর হাঁড়ি,সাতপিঠি খোলা, চিতাই স্যাকার খোলা ইত্যাদি, আর ছেলেরা চাকে করতো হাঁড়ি, শখের হাঁড়ি-কলসি, ইত্যাদি"।

বর্তমানে "এখন পেট বাঁচানোর জন্য যখন যেটা চলে সেটাই তৈরি করি, যেমন মাটির ব্যাংক, ছোট ছোট খেলনা, জগ, বদনা, পুতুল, পাখি, ছেলে পিলেদের ছোট ছোট হাঁড়ি, কড়াই, চুলা ইত্যাদি, সেই সঙ্গে কোনভাবে মনের তাগিদে দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এখনও কিছু শখের হাঁড়ি তৈরি করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে হয়তো আর পারবো না"। তিনি আবারও বললেন "শখের হাঁড়ি আমাদের বসন্তপুর ছাড়াও প্রেমতলিতে দুই একটি পরিবার, তারা বারঘরিয়া, গোদাগারির কিছু কিছু পাল পরিবার শখের হাঁড়ি তৈরি করে থাকে। তবে আমাদের থেকে তা ভিন্ন রকম, তত সুন্দর নয়, তত চকচকে নকশাও নয় এবং তত চলেও না"। শিল্পীর জানা "শখের হাঁড়ি শিকাতে ঝুলিয়ে রাখলে সুন্দর লাগে। শখের হাঁড়ি, আগে মেলাতে গেলে, মিষ্টি ভরে নিয়ে আসতো। আত্মীয় কুটুম বাড়ি যাওয়া আসার সময় শখের হাঁড়ি নিয়ে যেতো। তাছাড়া পূজার সময় শখের হাঁড়ি, ঘট, কলসী প্রদীপ ব্যবহার হতো এবং বর্তমানেও হয়, তাছাড়া হিন্দুদের বিয়েতে দুটি লাল রঙের কলসী (হলুদ ও সাদার উপরে শুধু লাল রঙের কাজ) ব্যবহার হয়। তা ব্যতীত ঘটের উপর তিনটি করে চন্দন ও সিদুরের ফোটা দিয়ে তা ব্যবহার করা হয়" । তিনি জানালেন "আমাদের শখের হাঁড়ি আবলের আঠালো কালো মাটি দিয়ে তৈরি হয়। মাটিকে আমরা ল্যফ দিয়ে কাটি, ল্যফটাতে কাটার সময় বিভিন্ন আঁশ ও ছোট খোলা পাথর, কাকর যা থাকে তা ধরা পড়ে যায়, তা ফেলে দেই। পানি দিয়ে ভিজিয়ে তা পা দিয়ে ভালো করে স্যানে চাপ করে আমরা চাকে গোটা তুলে বিভিন্ন রকম শখের হাঁড়ি তৈরি করি। শখের হাঁড়ির উপরের অংশ টুকু চাকে বানিয়ে রোদে একটু শুকিয়ে তারপর তলা

লাগানো হয়। তলা পানি দিয়ে ভিজিয়ে চটি দিয়ে আঠাল গুটা মাটি দিয়ে। তারপর পিটনা দিয়ে পিটিয়ে কয়েক বারে (তিনবার)। তা রোদে শুকিয়ে পুড়াই। আগে মুখ ছোট ও পিছনে খোরা লাগানো শখের হাঁড়ি তৈরি হতো । তাছাড়া কলসী, ঘট, বড় হাঁড়ি সকলের মুখই ছোট সাইজের ছিল"।

"বর্তমানে শখের হাঁড়ির পিছনে খোড়া লাগানো হয় না। কারণ খোড়া লাগানোর যে খাটনি, তার মূল্য পাওয়া যায় না, তাই বর্তমানে খোড়া লাগানো ছাড়া শখের হাঁড়ি তৈরি হয়"। তিনি জানালেন "প্রথমে তেতুলের বিচি ভেজে উপরের লাল খোসা ফেলে দিয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে ছেঁচে জ্বাল দিয়ে আঠা বের করা হয়। ঐ আঠাতে চক পাউডার দিয়ে হাঁড়িতে প্রলেপ দেওয়া হয়। এইভাবে দুইবার প্রলেপ দিতে হয়। তারপরে পিউরী (হলুদ রং) তেতুলের বিচির আঠা দিয়ে আরেক বার প্রলেপ দিতে হয়। তারপর রং অথ্যাৎ নকশা করবো (যেমন নীল, গেরীমাটি, সবুজ) ইত্যাদি রং তেতুল বিচির আঠা দিয়ে রং, নকশা করতে হয়। লাল বা খুনি রং দুধ দিয়ে গুলিয়ে রং করতে হয়। হাঁড়িতে রং দেওয়া সম্পন্ন হলে পুনরায় তিনবার তেতুল বিচির আঠার প্রলেপ দিতে হয়। এই রং ছাগলের ঘাড়ের একগুচ্ছো চুল পানিতে ভিজিয়ে হাতের মুঠে নিয়ে ছুচালো হয়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে কেটে তা বাঁশের কঞ্চিকে চিকন করে তার মধ্যে গোড়ার অংশটা সুতা দিয়ে তুলির মত করে বেঁধে সেই তুলি দিয়ে রঙের কাজ হয়। বর্তমানে চকচকে করার জন্য রং দেওয়ার পর বার্নিশ, রজন, চাঁচ ইত্যাদির প্রলেপ দেওয়া হয়"।

শখের হাঁড়ির নকশা সম্পর্কে তিনি জানালেন "আগে মাছ, পাখি, হাতী, ঘোড়া, ফুল, বিভিন্ন রকম ফুল, পাতা, চিরুনী ইত্যাদির নকশা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অনেক রকম ফল, ফুল, ইত্যাদি নতুন নকশা করা হয়। আগেরগুলো দাদুর কাছ থেকে শিখেছিলাম বর্তমানেরগুলো এক এক জায়গা থেকে দেখে এক এক রকম করে নিজে করার চেষ্টা করি।"

"আগে মাছ, কাঁটা, ফুল ও দলের নকশা বেশী ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সেগুলো ছাড়াও অনেক রকমের ফল, ফুলের নকশা তৈরি করি। প্রকৃতি থেকে দেখেই নকশা হাঁড়িতে তুলি, করি।" শিল্পী জানান, "গৌরীর বিয়ের সময়ে পালের সৃষ্টি, তখন থেকে নকশা ব্যবহৃত হয়। আগে রং ছিলনা। সে সময় আতপ চালকে পিসে পানি দিয়ে গুলিয়ে হাঁড়িতে বা ঘটে রঙের প্রলেপ দেওয়া হতো। তারপর তিনটা সিদুরের ফোটা দিতো, তিনটা চন্দনের ফোটা দিত । পরে রঙের ব্যবহার হয়।"

কিভাবে শখেরহাঁড়িতে নকশা তোলা হয় এ প্রসংগে সুশান্ত জানালেন, "আমি প্রথমে পিউরী অথবা সাদা রং দেওয়া হাঁড়িটিতে হাতের কেনি আঙ্গুল হাঁড়ির কাধে ঠেকিয়ে এবং পেটটা মাটিতে রেখে ডান হাতে পেট বরাবর করে কশি বা লাইনটানি, আস্তে আস্তে

ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে কশি টেনে পুরো হাড়ির পেটের চারদিকে কশি টানা হয়। এক্ষেত্রে লাল রং ব্যবহার করি এবং হাঁড়িতে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী দু' লাইন, তিন লাইন, চার লাইনের কশি টানি এবং কশির মাঝের ফাঁকা অংশে মাছ, ফুল পাখি, হাতী, ঘোড়া, কাকই, শাপলা কলমি ফুল নকশা করি। এবং লাল রং দিয়ে নীচের অংশে দল তৈরি করি। সেটা তিন লাইনে তিন রকমের ঝোলান হয়। আমি মাছের নকশা তৈরিতেই সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমি সবচেয়ে সুন্দরভাবে মাছ তৈরি করতে পারি। মাছ তৈরি করতে প্রথমে লেজ, পরে মাথা এবং এর পরে দেহ বানাতে দুই দিক থেকে লাইন যোগ করে দেই। শাপলা ফুল বানাতে প্রথমে মধ্যের পাপড়ি খাড়া করে দেই, তারপরে দুপাশ থেকে পাপড়ি জোড়ায় জোড়ায় যোগ করে দেই। এবং সুন্দর করার জন্য সাদা রঙের রেখা টেনে দেই। এই কাজগুলো আমার স্ত্রী, আমার ভাই সন্তোষ কুমার পাল বয়স ৩০ বৎসর এবং আমার ছেলে সঞ্জয় কুমার পাল ১২ বৎসর ও ছেলে মৃত্তুন কুমার পাল ১০ বৎসর এরা সকলেই কমবেশী শখের হাঁড়ির রঙের কাজ করতে পারে। আমার মতো এখনও তারা দক্ষ হয়নি, আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে কশি টানা ও রং করতে পারি"।

তিনি জানান "আগে দাদুর সংগে বিদুরপুর হাটে, নওহাটা হাটে, ধুবলের মেলা, কামারগাঁয়ের মেলা, তারপর নওহাটা পূজার মেলা, রথের সময় এবং তা ব্যতীত দাদুর সংগে গ্রামে ভাড়ে করে শখের হাঁড়ি বিক্রি করতাম"।

"বর্তমানে মাটির ব্যাংক , টব, গামলা, খোলা ইত্যাদি তৈরি করে হাটে ও গ্রামে এবং শহরের দোকানে বিক্রি করি। শখের হাঁড়ি সেরকম বিক্রি হয় না।"

শিল্পীর একটি দিনের কাজের বিষয়ে জানালেন , "সকালে ঘুম থেকে উঠে তিন ঘন্টা চাকে জিনিস তৈরি করি। তারপর পরিবারের সকলে ঐসব জিনিস পিটিয়ে তৈরি করে। বিকালে কখনও মাটি তৈরি করি। কখনও রাতে রং করি, দুপুরে চান করার পরে পূজা অর্চনা করি। এভাবেই দিন পাড়ি দেই"।

শিল্পীর সামগ্রিক সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানালেন" আমি বসন্তপুরে মোট ৩০ ঘরে যে পাল রয়েছে তাদের বিচার-আচার, পূজার আয়োজন করা, অন্ন প্রাসন, মৃতের সৎকার ইত্যাদি ধর্মীয় সামাজিক কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকি। আমি মর্যাদার সাথে সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে পরিবারের (১০ জন) ভরণ পোষণ এবং দাদুর স্মৃতি বহন করে শখের হাঁড়ির ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছি । যেহেতু আর্থিক সংগতি নেই। আমার ছেলেদের লেখাপড়া করাতে পারলাম না বলেই তাদেরকেও আমার মত শখের হাঁড়ি বানিয়ে যেতে হবে। তবে তারা এই পেশা কত দিন চালিয়ে যেতে পারবে তা আমি বলতে পারি না"।

রাজশাহীর শখের হাঁড়ির গড়ণ, রূপ ও বৈশিষ্ট্য একান্তই রাজশাহী অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং স্বাতন্ত্রের দাবিদার। রাজশাহীর শখের হাঁড়ি প্রয়োজনের ছাড়িয়ে সৌন্দর্যের সুষমার। শিল্পী সুশান্ত কুমার পালের তৈরি শখের হাঁড়ি রাজশাহীর শখের হাঁড়ির

ঐতিহ্যকে যথার্থই প্রতিনিধিত্ব করে। স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে লোক সমাজের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় প্রবহমান ধারায় বেঁচে থাকে লোকশিল্প। রাজশাহীর শখেরহাঁড়ির সৃষ্টির সংগে সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক -সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট শিল্পীর অনুভূতি ও চেতনাকে নাড়া দিয়েছে তা শিল্পীর জবানী থেকে অবহিত হওয়া যায়। শিল্পীর অনুভূতি ও চেতনার জগৎ তার সৃষ্টি রাজশাহীর শখেরহাঁড়ি সৃষ্টিতে ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারাকে অনুসরণ করিয়েছে। পূর্বপুরুষ থেকে শেখা কৌশল ও দক্ষতা, এসব নিয়ে জীবনযাপনের তাগিদ। কালভেদে তার অনুভূতিতে, জীবনযাপনে এবং শখের হাঁড়ি সৃষ্টিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে তার প্রমাণ শিল্পীর নিজের কথায়।

যেহেতু লোক কারুশিল্প সাংস্কৃতিক, নদীর শ্রোতধারার মত প্রবহমান এবং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আমাদের জীবনে যেমন সতত চলমান, সেহেতু বাংলাদেশের লোককারুশিল্পের রত্নডান্ডারের এক অমূল্য সম্পদ রাজশাহীর শখের হাঁড়ি সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়, প্রবহমান, চলমান থাকবে। এর যথাযথ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও পুনরুজ্জীবনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১. Chattopadhay Kamaladevi. Handicrafts of India. I.C.C.R New Delhi 1975:137.

২. Pal M. K. Crafts and Craftsmen in Traditional India. 1978.: 177.

৩. Chattopadhay Kamaladevi . Handicrafts of India ICCR. New Delhi 1975: 137.

বাংলার বয়নশিল্প

এই বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ যেসব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছিল তার মধ্যে মিসরের নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চল, ভারতীয় উপমহাদেশ, পেরু, চীন এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চল অন্যতম। প্রতিটি অঞ্চলে এক একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এসব অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও গড়ন বিশ্বসভ্যতার পরিমন্ডলকে করেছে মহান, ঐশ্বর্য্যময় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লিখিত অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আজকের আধুনিক জীবনযাত্রায়, আধুনিক মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, সর্বপরি সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রাচীন সভ্যতার নানা উপাদান, উপকরণ এখনো আমাদের জীবনে সক্রিয়, প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর। এমন কিছু উপাদান, উপকরণ রয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিত এতটুকু বদলায়নি, বলা যায়, অপরিবর্তিত। এক একটি প্রাচীন সভ্যতা আমাদের দিয়েছে মানুষের অনুভব, মনন, চিৎপ্রকর্ষ, সৌন্দর্যবোধ, কারিগরি ও প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাসমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত-রত্নসম অমূল্য সম্পদ।

প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা বিশ্বের এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নৃগোষ্ঠী কর্তৃক সৃজিত, লালিত, বিকশিত ও রূপলাভ করেছিল। এক একটি প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য স্থির হয়েছিল ঐসব প্রাচীন সভ্যতার সংগে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ভৌগলিক আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত উপাদান-কাঁচামাল দ্বারা। কাঁচামাল বা উপকরণ অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টির পথ প্রশস্থ করেছে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের অন্তর্গত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ড। এভাবেই প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, রূপ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বৈশিষ্ট্য-চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। সেজন্য আজকের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনেও তা ক্রিয়াশীল।

বস্ত্র মানুষের ন্যুনতম চাহিদার একটি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বস্ত্র-বয়নশিল্প এক বিরাট মাইল ফলক। বস্ত্র-বয়নশিল্প বস্তুত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। বিশ্বের সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এর একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই বয়নশিল্পে রয়েছে বহুমাত্রিকতা। প্রত্নতত্ত্বের সংগে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। আদিম, প্রাচীন মানুষের বস্তুজাত সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্মাণে বস্ত্র-বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছে। বয়নশিল্পের সংগে সম্পর্কিত নানা বৈচিত্রময় মোটিফ, নকশা পর্যালোচনায় সে সব রহস্য উদ্ধার, আবিষ্কৃত হবে। তা মানুষের জীবন, ধর্ম ও সমাজের আচার অনুষ্ঠানের নানা সাংকেতিক দিককে উদঘাটন করবে। আর্থ-সামাজিক দিক তো রয়েছেই। শৈল্পিক বিশ্লেষণও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষকদের অনুমান প্রায় দশহাজার বছর আগে মেয়েরাই প্রথম প্রকৃতি থেকে উপকরণ, কাঁচামাল সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল যা দিয়ে সুতা ও বস্ত্র তৈরি সম্ভব। এবং সুতা তৈরি ও পাকানোর প্রাথমিক কৌশলও মেয়েরা আয়ত্ব করেছিল।[১] প্রাচীনকালে সুতা তৈরিতে বহু ধরনের কাঁচামাল, উপকরণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলেছিল। সুতা তৈরি সম্ভবও হয়েছিল। তবে প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি প্রধানত চারটি প্রাকৃতিক উপাদান তন্তু উপকরণ বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং চারটি তন্তুর প্রত্যেকটি এক একটি প্রধান সভ্যতার সংগে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত।[২] মিসরীয় সভ্যতার সংগে শণ জাতীয় তন্তু, চীনা সভ্যতার সংগে রেশম, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সংগে উল এবং ভারতীয় ও পেরু সভ্যতার সংগে তুলা উল্লেখযোগ্য। ফলে মিসরীয়, চীনা, মেসোপটেমিয়া, পেরু এবং ভারতীয়সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক তন্তু বা আঁশ দিয়ে বয়নশিল্পের প্রসার, বিকাশ লাভ করে চরম উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল। উল্লিখিত প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপাদান হিসেবে বয়নশিল্পের বৈচিত্রময় উল্লেখই যথেষ্ট। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা বলতে তার নির্দিষ্ট তন্তু আঁশ থেকে তৈরি বয়নশিল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজ নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশের আলোকেই মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান তন্তু বা আঁশ সনাক্ত ও চয়ন করে, সুতা পাকিয়ে বয়নশিল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছে। চারটি তন্তু বা আঁশ কিভাবে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে আজকের আধুনিক রূপে রূপান্তরিত ও বিকশিত করেছে, তা সত্যি বিস্ময়ের বিষয় এবং প্রাচীন সভ্যতাসমূহকে সনাক্ত ও গবেষণার বিষয়ে এই সূত্র বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। গবেষকদের মতে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রাপ্ত প্রমাণ দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে তুলা বস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে। এবং পেরুতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে। ভারতীয় উপমহাদেশ একটি বিশাল ত্রিভুজ আকারের। হিমালয়পর্বতমালা ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ উত্তরসীমা সৃষ্টি করেছে। সরু দক্ষিণসীমা ভারত মহাসাগর দ্বারা অভিক্ষিপ্ত। হিমালয়পবর্তমালা অঞ্চল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর উৎস স্থান। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে এর দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলে হিমালয়পর্বতমালা তিব্বতী ও মধ্য এশীয় অঞ্চলের হিম, ঠান্ডা বায়ু প্রবাহে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সমতল ও নিম্নভূমি ভারতের পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশে অত্যাধিক মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের ফলে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এ ধরনের জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এতদাঞ্চলের ভূমি সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উর্বর বলে খ্যাত। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের

তীরবর্তী বদ্বীপ অঞ্চল বাংলাদেশ মৌসুমীবায়ুর আবহাওয়া দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রবাহিত। আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকুল রূপ ও চরিত্রের দরুন উল্লিখিত অঞ্চলে ঘন জন বসতি একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ শত সহস্র বছর ধরে কেবল এসব অঞ্চলে বসতির জন্য পাড়ি জমিয়েছে।

বাংলাদেশ অঞ্চল ও ভারতের মাদ্রাজে প্রাচীনকালে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হতো এবং এ অঞ্চলে বয়নশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল প্রাচীনকাল থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশ অঞ্চল এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশের বয়নশিল্প প্রসংগে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন। "বঙ্গদেশ বস্ত্র-বয়নশিল্পের জন্মভূমি। বসরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্র বয়নশিল্প তেমনি বঙ্গের নিজস্ব। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"[৩] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন,। "বাংলাদেশের বস্ত্র বয়নশিল্পের খ্যাতি খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, Pariplus Erythri Mari নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে"।[৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে বয়নশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন সপ্তদশ শতকের পূর্বের পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর কারণ প্রচুর বৃষ্টিপাত, বর্ষা ও মৌসুমী আবহাওয়ায় স্যাতসেতে অবস্থায় বয়ন শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন বিনষ্ঠ হয়ে গেছে বা টিকে থাকেনি। গ্রীকদের কাছ থেকে প্রথম লিখিত জানা যায় যে, আলেকজান্ডার ভারতের পুস্পশোভা নকশাপূর্ণ মসলিন বস্ত্র এবং স্বর্ণসূতা নকশী আঙরাখা পোশাক দেখেছিলেন। তারা তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে তুলা গাছে তুলা উৎপন্ন হতে দেখে। ভারতের দক্ষিণপূর্বাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বয়নশিল্পের প্রসার যে ঘটেছিল তা স্পষ্ট। এতদাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি সকল সময়ে বয়নশিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম কারণ হচ্ছে, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং রাজকীয় ও সমাজপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা। বর্হিবাণিজ্যের প্রয়োজনে চাহিদা বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ এবং যখনই পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন, প্রতিকূলতা, পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস বা পরিহার করা হয়েছে তখনই এতদাঞ্চলে বয়নশিল্পের অবনতি ঘটেছে। প্রমাণস্বরূপ ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে, ইংল্যান্ডে যন্ত্রচালিত তাঁতে তৈরি বস্ত্র ভারতের বাজারে আসার পর অর্থাৎ যখন থেকে এ দেশের ঐতিহ্যগত পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই। অর্থাৎ ১৮০০ সাল থেকে এখানকার জামদানী ও মসলিনের মত উন্নত বস্ত্রের উৎপাদন দারুণ বাধার সম্মুখীন হলো। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

লিখিত বিবরণে বয়নশিল্পের চরম উৎকর্ষের প্রমাণ হিসেবে ঢাকাই মসলিন ও জামদানীকে গণ্য করা হয়। ভারতে মুসলমানদের আগমন, মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা,

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল বাংলার বয়নশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলায় মোগল ও বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় এখানকার বয়নশিল্পে ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানসমূহ যুক্ত হয়েছে। ফলে এ দেশের বয়নশিল্পের শৈল্পিক বিষয়টিকে উন্নততর করে তুলেছিল। মসলিন ও জামদানী বস্ত্রে যে নকশী কাজ ও মটিফ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাতে ইসলামী শিল্পকলার নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর ফলে মসলিন ও জামদানী সারা বিশ্বে প্রায় অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সাধনের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত উচুমানের ও মূল্যের বস্ত্র হিসাবে বিবেচিত ছিল। এভাবেই বাংলাদেশ ও ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এলাকায় তুলা বস্ত্রের এত উন্নতি সাধন হয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের মসলিন ও জামদানী শ্রেষ্ঠতম বলে মোগল আমলে ভারতে ভ্রমণকারী বহু ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারীর লেখায় প্রমাণ মেলে। আজকের মসলিন ও জামদানী শাড়ি সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক এবং অব্যাহত প্রবহমান ধারা। এখনো বাংলাদেশের তুলা বস্ত্রের মধ্যে জামদানী শ্রেষ্ঠতম। পুরনো ঐতিহ্যের প্রতিফলনের আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর আমাদের দক্ষ তাঁতী ও কারিগরগণ এখনো রেখে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে, বজায় রাখছেন ধারাবাহিকতা। এক সময়ে এ দেশে যে বৈশিষ্ট্যময় ফুটি তুলা উৎপন্ন হতো, তার বীজ এখন কালের অতল গহবরে হারিয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে সেই ফুটি তুলা হয় না। বিদেশ থেকে তুলা ও সুতা আমদানি করে এদেশের বয়নশিল্প চলছে। ফলে মসলিনের ও জামদানীর সুতার সূক্ষ্মতা আমাদের দেশ থেকে, আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। বিদেশী তুলার সুতা দিয়েই এখন মসলিন প্রজাতির জামদানী তৈরি হচ্ছে। অধিকতর সূক্ষ্ম সুতার অভাবে আগের মত মসলিন এখন আর উৎপন্ন সম্ভব হচ্ছে না। যা তৈরি হচ্ছে, তা দ্বিতীয় শ্রেণীর মসলিন ও জামদানী।

গত একশ বছর অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এ পর্যন্ত এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে বাংলাদেশ, ভারতীয় উপমহাদেশ বৃটিশ শাসিত উপনিবেশ ছিল। এ সময়ে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্বের বাণিজ্য বাজারে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কলের তৈরি মিহিকাপড় অনেক সস্তায় সারা বিশ্বে বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পের বিস্ময় চমৎকারী মসলিন এবং জামদানী মোগল সম্রাট, বাংলার সুলতান ও সমাজপতিদের যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল এ সময় অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশে ও বিদেশে কলের কাপড়ের সংগে মূল্যের প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে পারছে না। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের গৃহীত দমনমূলক ব্যবস্থা, নীতি, আইনের ফলে হাতে বোনা

মসলিন, জামদানী কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশী পড়ে যায়। ফলে পরিনতি যা হওয়ার তাই হলো, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মসলিন ও জামদানী ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল।

যদিও জামদানীর ক্ষীণধারাটি কোন রকমে টিকে থাকলো, সূক্ষ মসলিন পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে গেল। মসলিনের গুটি কয়েক নিদর্শন পৃথিবীর যাদুঘর গুলোতে ঠাই পেল। এই অবস্থা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে গেল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান, ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বাংলাদেশে বয়নশিল্প কিছু অনুকুল আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা পেল। মধ্যবিত্ত সমাজে জামদানীসহ অন্যান্য উন্নতমানের তাঁত বস্ত্রের কদর, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলো। তবে তাঁতিদের পক্ষে সূক্ষ মসলিন তৈরি সম্ভব হল না। জামদানী তৈরিতে কিছু প্রাণ ফিরে এলেও প্রাচীন ধারার সূক্ষ কাপড়ের জমিনে নকশী মোটিফ ফুটিয়ে তোলা তাতীদের পক্ষে সম্ভবপর হলনা। বিশেষ ধরনের ফুটি তুলার অবলুপ্তি সাধন, বিদেশী সুতার উপর নির্ভরতা ও প্রাচীন কৌশলও দক্ষতার সংগে তাঁতীদের সংশ্লিষ্টতা ক্রমশঃ কমে যাওয়ার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি রয়েছে পৃষ্ঠপোষকতার স্বাভাবিক প্রবাহের অনুপস্থিতি। কিন্তু ১৯৭১এ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে নতুন পটভূমি, প্রেক্ষিৎ সৃষ্টি হলো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে গুণগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এদেশের ঐতিহ্যের বয়নশিল্পেও গতিসঞ্চার হলো। জামদানী, ঢাকাই বুটি, টাংগাইল শাড়ী, খদ্দর ইত্যাদি তাঁতবস্ত্রের জাতীয় পর্যায়ে সচেতনার সংগে কদর বাড়লো। সীমিত পর্যায় হলেও জামদানী জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের বস্তু বলে সনাক্ত হলো। বিশ্বে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরতে চলমানসাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেব বিভিন্ন প্রচারে, ফ্যাশনে, জামদানী অন্তর্ভূক্ত হলো। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে, জামদানী শাড়ী মর্যাদার বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। এর প্রমাণ গত ২৫ বছরে রাজধানী ঢাকায় জামদানী, টাঙ্গাইল, ঢাকাই ইত্যাদি দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে, বাজার জাতের সুবিধা, কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। গুণগতমান বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। প্রাচীন নকশার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। নতুন নকশার উদ্ভাবন হচ্ছে। এই পুনরুজ্জীবন কাজটি জামদানীর ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। অতিসম্প্রতি টাঙ্গাইল শাড়ীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

বয়ন শিল্পের ঐতিহ্যিক পরিচয় জামদানী, টাঙ্গাইল, ঢাকাই শাড়ীর পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা গেলেও এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা তেমন হয়নি। তথাপি, এদেশের সচেতন ও সংস্কৃতিবান নাগরিকগণ জাতীয় সংস্কৃতির

ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে জামদানী, ঢাকাই, ও টাঙ্গাইল শাড়ীসহ আমাদের তাঁত শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

এ প্রসংগে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ আয়োজিত শতাব্দীর বয়ন শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রদর্শনী এদেশের সামগ্রিক জাতীয় সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পুরানো জামদানীর নিদর্শন আমাদের অনুভবে ও চেতনায় ছিল অথচ দৃষ্টি ও স্পর্শের বাইরে ছিল। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ দেশে প্রাপ্ত, সংগৃহীত পুরানো জামদানীর নিদর্শনসমূহ আমাদের দৃষ্টি ও স্পর্শের আওতায় এনেছিলেন। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত প্রাচীনতম জামদানী শাড়ীটির সময়কাল ১৮৯৩ সাল। এ ছাড়াও রয়েছে ১৯১৩, ১৯২৩ এবং ১৯৩৩ সালের। এছাড়া একটি টাঙ্গাইল কাতান শাড়ীর সময়কাল ছিল ১৮৭৭ সাল। অপর আর একটি শাড়ী ছিল ঢাকার টিসু শাড়ী সময়কাল ১৮৭৩ সাল। প্রদর্শনীর পুরানো শাড়ীগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিলাম্বরী জামদানী উল্লেখের দাবি রাখে। বাঘনলী, জুইফুল, পদ্ম, করলা মোটিফগুলো প্রাচীন জামদানী শাড়ীগুলোকে করেছে উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যময়। নীলাম্বরী জামদানীর নীল রংএর ঔজ্জ্বল্য এতদিনপরেও এতটুকু নষ্ট হয়নি। জামদানী শাড়ীর এই নীল রং সৃষ্টি করেছে আমাদের দেশের গ্রামের কারিগর তাঁতী। তাঁতীদের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি জামদানী শাড়ীর মোটিফসমূহের বৈচিত্রময় ও বর্ণাঢ্য উপস্থাপন আধুনিক শিল্পীর অনুভব ও চেতনার চিত্রকল্পকেও হার মানায়। কারণ এসবই সৃষ্টি করেছে আমাদের দেশের গ্রামের তাঁতী। তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কৌশল ও দক্ষতাকে সম্বল করেই তারা এসব জামদানী শাড়ী তৈরি করেছে। যা আজো কালজয়ী। নতুন করে জাতীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হলে বাংলার কারিগর ও তাতীগণ জামদানী ও মসলিনের ঐতিহ্যকে পুনরায় পুনরুজ্জীবনে সক্ষম হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা হলে এবং কারিগরদের সমিতি করে কারিগর ও তাতীদের দ্বারা মসলিন ও জামদানীসহ অন্যান্য তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন নিশ্চিত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এবং দেশে বিশেষ করে জামদানীর বাজারজাতকরণের একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। এছাড়া বিদেশে বাজার সৃষ্টিতে যথাযথ প্রচারসহ প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশে একটি স্থায়ী জামদানী প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হলে দেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

জামদানীসহ বয়নশিল্পের যে সকল প্রাচীন নিদর্শন ব্যক্তিগত সংগ্রহে এখনো রয়েছে এসব নিদর্শনাদি সংগ্রহ করে ঢাকায় একটি "বাংলাদেশের বয়নশিল্প যাদুঘর" স্থাপন করা যেতে পারে। এই যাদুঘর স্থাপন করা হলে বাংলাদেশের জাতিসত্বা নির্মাণের

অন্যতম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান বয়নশিল্পের ঐতিহ্যের সংগে এদেশের আগামী প্রজন্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও একাত্মতা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত যাদুঘর বয়নশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, পুনরুজ্জীবনে ও গবেষণায় এক শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের একটি ভৌগলিক সীমারেখা রয়েছে, এদেশের মানুষ তার পরিবেশ ও জীবনযাত্রার সীমারেখায় জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণ করে চলেছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে। স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বয়নশিল্পের ঐতিহ্য এদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা। জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে, বিকাশে বয়নশিল্পের ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

তথ্য নির্দেশ

১. Kax wilson. A History of Textiles 1979. page 1.
২. প্রাগুক্ত।
৩. দিনেশ চন্দ্রসেন, বৃহৎবঙ্গ পৃঃ ৯৩২।
৪. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) পৃ ঃ ১৭৬।

নকশীকাঁথার অতীত, বর্তমান এবং রূপান্তরের ধারা

সকল দেশের লোকসংস্কৃতির মত আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতি নির্মিত ও রূপলাভ করেছে এদেশের প্রকৃতি-পরিবেশে মানুষের জীবনযাপনকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য-সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের (Cultural trait) সমন্বয়ে, মিলনে। সাংস্কৃতিক উপাদান সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি একক বা মাত্রা হিসেবে কাজ করে। সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মিলনে ও সমন্বয়ে যে সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ, অবয়ব (Encyclopaedia Brittanica: 1987)[১] সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মিলনে ও সমন্বয়ে আবহমানকাল ধরে যে সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ, অবয়ব গড়ে উঠেছে, তা এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারার, জীবনযাপনের। এই জীবন ধারা আবহমান বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকজীবনধারা, বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো হচ্ছে কোন বস্তুঃ লাঙ্গল, মাথাল, খালই, ঢেকি, কুলা, মৃৎপাত্র, বস্ত্র, কাস্তে, নকশী কাঁথা, নৌকা, ঝুড়ি, পাটি; জীবনযাপন পদ্ধতি সংক্রান্তঃ কাপড় বোনা, নকশীকাঁথারসেলাই করা, ঝুড়ি বোনা, পাটি তৈরি করা, নৌকা ও গরুরগাড়ী বানানো, মৃৎপাত্র তৈরি করা, চিত্র অংকন; লোকজ বিশ্বাসঃ ধর্মীয় ও লোকজ আচার-আচরণসমূহ; মৌখিক, বাচনিকঃ লোকসংগীত, লোক সাহিত্য; শারীরিক, আত্মরক্ষামূলকঃ শারীরিক অঙ্গভঙ্গী, খেলাধুলা নৃত্য, অনুষ্ঠান, আনন্দ-লোকজ উৎসব, মেলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান সুতিবস্ত্র। এর সংগে সংশ্লিষ্ট বয়নশিল্প, নকশীকাঁথা এবং কাঁথা সেলাইএর কাজ। এসব উপাদান সমন্বিত হয়ে একটি সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এবং এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অবস্থাও একান্তই বাংলাদেশের। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি নির্মাণে, বৈশিষ্ট্য নিরূপনে নকশীকাঁথাও সাংস্কৃতিক উপাদান ও পরিবেশ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বস্ত্র, বয়নশিল্প, নকশীকাঁথা এবং নকশীকাঁথা সেলাই একান্তই বাংলাদেশের জীবনধারার বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্রে বৈশিষ্ট্যময়। বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশে এখানে বসবাসরত মানুষের জীবন যাপন ও জীবন ধারার সংগে বয়নশিল্প সংশ্লিষ্ট সুতিবস্ত্র এদেশের ঐতিহ্যের,

সংস্কৃতির (মাহবুব: ১৯৯৩)[২]। সেই সংগে বস্ত্রসংশ্লিষ্ট কাঁথা-নকশী কাঁথাও বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট।

নকশীকাঁথায় যেসব সাংস্কৃতিক উপাদান সংশ্লিষ্ট, সম্পৃক্ত সেগুলো পুরানো বস্ত্র, শাড়ী, লুঙ্গী, ধুতি, সাদা ও রঙ্গীন সুতা, নকশী কাঁথা, সেলাই কাজ, সেলাইয়ের সুই, মানুষের অনুভব ও চেতনা। ফলে নকশীকাঁথা কেবল বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে থাকেনি বরং সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ নির্মাণ করেছে। অনিবার্যভাবে নকশীকাঁথা পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদানে এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশে।

যেহেতু নকশীকাঁথা বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিকপরিবেশ, সেহেতু সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্রমপুঞ্জিত ধারার ধারাবাহিকতা নকশীকাঁথা ধারণ করে। ফলে নকশী কাঁথার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপান্তরের ধারাটি সনাক্ত, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ শিল্প ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব ছাড়াও জাতিতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক নিরিখে হওয়া বাঞ্ছনীয়। নকশী কাঁথার গবেষণা ও মূল্যায়নে এপর্যন্ত শিল্পইতিহাস ও শিল্পতত্ত্বের প্রেক্ষিতেই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক নিরিখে নকশী কাঁথার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন গুরুত্ব পায়নি। অথচ নকশী কাঁথার জাতিতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক নিরিখে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ শিল্পইতিহাস ও শিল্পতত্ত্বতো রয়েছেই সেই সংগে জাতিতাত্ত্বিক নিরিখে নকশীকাঁথার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ, ব্যাপক এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে (মাহবুব ঃ ১৯৮৩)[৩]।

কেন রূপান্তর

নকশী কাঁথার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপান্তরের ধারার মূল্যায়নে সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নকশীকাঁথা লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান বলে এর রূপান্তরের ধারা সংস্কৃতির রূপান্তর ধারার প্রক্রিয়ার অনুরূপ। সংস্কৃতি যেমন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিকরণ (Cultural diffusion) ও সাঙ্গীকরণ (Acculturation) প্রক্রিয়ায় অব্যাহতভাবে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান থাকে তেমনি বাংলাদেশের লোক সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং অবস্থা হিসেবে নকশীকাঁথাও ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে প্রবহমান রয়েছে। এবং কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে নকশী কাঁথার রূপান্তরের ধারার ধারাবাহিকতাকে সনাক্ত করা যায়। রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথা অতীত থেকে বর্তমানের এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের জন্য চলমান, সক্রিয় রয়েছে। বাংলাদেশের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির উপাদান নকশীকাঁথা অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের মত সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক-জাতিতাত্ত্বিক নিরিখে। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রভাব নকশী কাঁথায় অনিবার্যভাবে পড়ে। রূপান্তরের ধারা নকশী কাঁথায় বিধৃত হয়।

সংস্কৃতি-লোক সংস্কৃতি স্থির , নশ্চল নয়, জঙ্গম "The basic tendencies in social and cultural systems are toward change, rather than toward states of equilibrium. ... one of its most fundamental properties is change" (Firth: 1951)[৪] (Leach : 1954)[৫] (Herskovits : 1955)[৬], (Vogt : 1960),[৭] ফলে লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান লোক ও কারুশিল্প প্রাণবন্ত, প্রাণশক্তিপূর্ণ প্রবহমান, সচল-অনির্বাণ শক্তি। সমাজ জীবনের ছন্দে ও তালে যেমন পুরানোর ভাটা এবং নতুনের জোয়ার প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল, তেমনি লোক ও কারুশিল্প লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুরানো ঐতিহ্যিক ধারা ক্রমাগত, অবিরাম নতুন ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, মানিয়ে নিয়ে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সচল, প্রবহমান থাকে। অর্থাৎ নতুন পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিবর্তিত পটভূমিতে প্রথাগত ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের রূপান্তরিত আত্মপ্রকাশ সম্ভব। এটি একটি অব্যাহত ধারা। নকশীকাঁথাও সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে বাংলাদেশের লোকজীবন-লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ক্রমপুঞ্জিত ধারায় কালিক ব্যবধানে রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মত সচল, জঙ্গম, গতিময় হয়। সকল কালের, সময়ের বলে বিবেচিত হয়।

নকশী কাঁথার অতীত

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ, পদ্ধতি এদেশের গ্রামভিত্তিক প্রকৃতিনির্ভর পরিবেশ ও প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ, জীবনধারা এদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যর উপর প্রভাব প্রয়োগ করেছে। এদেশের প্রকৃতি কার্পাস তুলা, সুতি বস্ত্রের জোগান দিয়েছে। সেই সূত্রে পুরানো কাপড় দিয়ে নকশীকাঁথা সৃষ্টি করেছে লোক সমাজের মেয়েরা। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মেয়েদের তৈরি নকশীকাঁথা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান-লোক ও কারুশিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রকৃতি, পরিবেশে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে উপযোগিতার প্রেক্ষিতে এদেশের মেয়েদের অনুভব ও চেতনা নকশীকাঁথায় বিধৃত হয়েছে।

নকশীকাঁথা বাংলাদেশের লোকজীবনের লোকসংস্কৃতির। এই বিবেচনায় এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও তথ্যের তেমন বিবরণ পাওয়া যায়না। নকশীকাঁথা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ময়মনসিংহ গীতিকায়। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর "রামায়ণ কাব্যে" নকশী কাঁথার বিবরণ পাওয়া যায়।

"সীতার গুণের কথা কি কহিব আর .....।
কন্থায় আকিল কন্যা চান সুরুয পাহাড়॥
আরও যে আকিল কন্যা হাসা আর হাসি।
চাইরো পাড়ে আকে কন্যা পুষ্প রাশি রাশি॥

এছাড়া নকশীকাঁথা সম্পর্কে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য "আমরা বিভিন্ন মঙ্গল ও পুথিকাব্যেও রাজকন্যা, বণিক কন্যাগণ ও সাধারণ সমাজের নারীদের নকশীকাঁথা রচনার বর্ণনা পাই। অজস্র মেয়েলী ছড়া গীতেও আমরা কাঁথার বর্ণনা দেখি" (সিদ্দিকী ঃ ১৯৯৫)[৮]।

"মধ্যযুগের শেষ কবি ভারত চন্দ্র তাঁর কাব্যে কাঁথার বর্ণনা দিয়েছেন, "ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপসিদ্ধি লাড্ডু"।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে দিনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, কবি জসীম উদ্দীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনুরূপ বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের মত সাধারণ গ্রামের মানুষের শিল্পকলার নন্দনতাত্ত্বিক, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের নিরিখে এর মূল্যায়নে, উজ্জীবনে, নকশীকাঁথা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর গ্রামের সাধারণ মানুষের শিল্পকলা-লোক ও কারুশিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ায় লোক ও কারুশিল্পের ধ্বংস, অধোগতি, প্রতিকূল অবস্থা রোধে, মোকাবেলায় সেখানে যেমন গ্রামীণ লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষায় আন্দোলন, উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল অনুরূপভাবেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এদেশের লোক ও কারুশিল্পের রক্ষায় সংগ্রহ করেছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু দূর্লভ মূল্যবান নকশী কাঁথা। সেই থেকে দেশে বিদেশের যাদুঘরগুলোতে নকশীকাঁথা সংগৃহীত হচ্ছে। নকশীকাঁথা সম্পর্কে মূল্যায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশেও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৫০ এর পর বেশ কিছু মূল্যবান নকশীকাঁথা সংগ্রহ করেন এবং বাংলাদেশে লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, (মাহবুব ; ১৯৭৯)[৯]। দেশে ও বিদেশে যাদুঘরগুলোতে এ পর্যন্ত সংগৃহীত নকশী কাঁথাগুলোর মধ্যে (Zaman Neaz : 1993)[১০] । তেমন পুরানো, প্রাচীন কাঁথা নেই। অর্থাৎ যাদুঘর গুলোতে সংগৃহীত কোন নকশী কাঁথাই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের নয়। (গঙ্গোপাধ্যায় ঃ১৯৭৬)[১১] ।

বাংলার লোক গীতিকার মাধ্যমে ও যাদুঘরে সংগৃহীত নকশীকাঁথার সংগ্রহকালের ভিত্তিতে এর পর্যালোচনা করে নকশীকাঁথার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য প্রমাণাদিই পাওয়া যাক না কেন, এটা স্পষ্ট যে নকশীকাঁথা লোকসাংস্কৃতিক সম্পদ, উপাদান এবং এর প্রাচীনত্ব আমাদের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মতই প্রাচীন। আবহমান বাংলার। এদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের বৃহত্তম অংশ গ্রামের লোকজীবনের সাধারণ মানুষের জীবন ধারায় নকশী কাঁথার ঐতিহ্যের ক্ষীণ ধারা এখনো অব্যাহত।

লোক ও কারুশিল্প রূপান্তরিত হয় বহুমাত্রিক লক্ষ্যে, ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। এ প্রসংগে কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "ইতিহাসের বিবর্তন পথে বৈরাগীর পরিধেয় কন্থা কবে এবং কি করে বাঙালীর ব্যবহারের গৃহ উপকরণে পরিণত হয়েছিল, কি করে তার মৌলিক রূপের পরিবর্তন হয়ে সাধারণ ব্যবহারের কাঁথার অলংকার বৈচিত্র ও

অঙ্গসজ্জা লোক শিল্পের পর্যায়ে পরিগণিত হলো ইতিবৃত্তে তা কোথাও নথিভূক্ত হয়নি। এইরূপ পরিবতনের কাহিনী জানা না থাকলেও বর্তমানে যে সব কাঁথা পাওয়া যায় তার বৈচিত্র ও অঙ্গসজ্জা লোক শিল্পের পর্যায়ভূক্ত হয়ে সমাদর লাভ করেছে" (গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ১৯৭৬)[১২]।

লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির মৌলিক দৃষ্টিকোণ, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা যা বস্তুজাত সংস্কৃতির সারকথা। এ কারণে লোক ও কারুশিল্প বস্তুজাত, সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট। এজন্য কেবল উপযোগিতা, প্রয়োজনের সাদামাটা, সাধারণ লোক ও কারুশিল্প বস্তু থেকে সৌন্দর্যের, সুষম ও সুগঠিত, বর্ণাঢ্য, চিত্রগুণসম্পন্ন লোক ও কারুশিল্পে পরিণত হওয়ার পর্যায়সমূহকে কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে সনাক্ত করতে সক্ষম হই।

নকশীকাঁথা বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু, লোকশিল্প এবং নকশাকাজ-শিল্পকলাও বটে। রূপান্তরের ধারায় এই প্রক্রিয়া চলে। এ কারণে লোক ও কারুশিল্পে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যগুণ যুগপৎ ক্রিয়াশীল। এ প্রসংগে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। "At the opposite pole from oral literature in the spectrum of folklore lies material culture or folk life terms used to denote the physical objects produced in traditional ways. Material culture thus embraces folk architecture, folk arts and crafts. ... generally it may be said that material culture fills economic and aesthetic functions" (Encyclopaedia Brittanica : 1987)[১৩]।

নকশীকাঁথা বাংলাদেশের (Folk ways) লোকজীবনধারা-বস্তুজাত সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। কারণ বাংলাদেশের লোকজীবনধারায় এদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির অঙ্গ, উপাদান, সাংস্কৃতিক পরিবেশ সুতা, বস্ত্র এবং নকশীকাঁথা আবহমান কাল থেকে তৈরি হচ্ছে। সাধারণ পুরানো বস্ত্র সেলাইয়ের কৌশল ও দক্ষতার দ্বারা কাঁথা নকশীকাঁথায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ লোকজীবনের বস্তুজাত সংস্কৃতি-লোকশিল্প-নকশীকাঁথা উপযোগিতা থেকে নান্দনিক গুণের, সৌন্দর্যের রূপান্তরিত, পরিণত হয়। ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশীর মন্তব্য প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে। "Over time the operation of the latter have gradually transformed the Kantha from a utilitarian craft to a work of art, hence the word Nakshi Kantha "artistic quilt" or embroidered quilt came into use" (Qureshi : 1992) [১৪]।

বস্তুজাত সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বস্তু, জিনিসের মৌলিক আকার, গড়ন সময়ের ব্যবধানে সৌন্দর্যের, রূপের, রংএর, নকশার, সুষমার লোক ও কারুশিল্পে পরিণত হয়ে থাকে। কারুশিল্পী কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে লোক সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনধারার

প্রেক্ষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পকে চলমান রাখেন। ফলে লোক ও কারুশিল্প-নকশীকাঁথা উপযোগিতার ও সৌন্দর্যের, লৌকিক আচার আচরণের এবং প্রতিনিয়ত নকশীকাঁথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার গুণ ও বৈশিষ্ট্য একে চলমান, অব্যাহত রেখেছে। তবে স্থানিক ও কালিক ব্যবধান নকশীকাঁথার গুণে, বৈশিষ্ট্যে, রূপে ও সৌন্দর্য্যে রূপান্তর ঘটছে। রূপান্তরের ধারা নানা পর্যায়ে সনাক্ত করা যায়। সময়, কালের ব্যবধানে লোকজীবন ধারার রূপান্তরের মতই নকশীকাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে নানা পর্যায়ে এবং নকশী কাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়া চলেছে নিম্নলিখিত পর্যায়ে। (ক) উপকরণ, কলাকৌশল, (খ) উপযোগিতা, (গ) নকশী কাঁথায় মোটিফের ব্যবহার, (ঘ) শৈল্পিক, (ঙ) বাণিজ্যিক।

নকশীকাঁথা বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প-লোক সাংস্কৃতিক উপাদান। তথাপি এর বিশ্লেষণে, মূল্যায়নে, গবেষণায় যাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন নকশীকাঁথা পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মেয়েরা নকশীকাঁথা তৈরি করলেও যশোহর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঢাকা ও বরিশাল অঞ্চলের কাঁথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বৈশিষ্ট্যময় বলে বিশ্লেষণে উল্লেখের দাবি রাখে।

উপকরণ

লৌকিক শব্দকোষ গ্রন্থে কামিনীরায় কাঁথার অর্থ করেছেন "কয়েকটি কাপড় (সাধারণতঃ পুরাতন) একত্র সেলাই করিয়া গাত্রাবরণ বা শয্যাস্তরণ।"

কাঁথা বলতে কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বোঝাতে চেয়েছেন "বস্তুত পুরানো জীর্ণ কাপড়ের কানি হলেই কাঁথা হয়না, একাধিক পুরনো কাপড়ের টুকরা পাট করে একখানার উপরে আর একখানা রেখে অবিচ্ছিন্নভাবে সেলাই করে নিলে তবেই কাপড় কাঁথায় পরিণত হয়"। (গঙ্গোপাধ্যায়ঃ ১৯৭৬)[১৫]

মূলতঃ "পুরানো কাপড় কয়েক ভাজ (কখনো তিন, চার বা ছয় ভাজ) করে চার ধার সেলাই করে আটকানো হয়। পুরানো শাড়ীর পাড় থেকে নেয়া রঙ্গীন সুতা দিয়ে কাঁথার কেন্দ্রীয় মোটিফের কাজ হয়। পরবর্তীতে চার কোনায় সমধরনের নকশা বা মোটিফ বসানো হলে খালি অংশে ছোট মোটিফ বা জ্যামিতিক নকশা দিয়ে ভরাট করা হয়। সবশেষে সাদা অংশগুলোতে সাদা সুতা দিয়ে জমিনের অংশ সেলাই করা হয়"। (মাহবুব ঃ ১৯৮৩)[১৬]। এই রীতিতে সাধারণত কাঁথা তৈরি হয়ে থাকে। যাদুঘরে সংগৃহীত পুরানো কাঁথাগুলো এই নিয়মেই তৈরি করা হয়েছে।

পুরানো নকশীকাঁথা তৈরিতে সাধারণত পুরানো শাড়ী, ধুতি, লুঙ্গী ব্যবহার করা হয়েছে। পুরানো নকশীকাঁথার উপকরণ দেখলে তারই প্রমাণ মেলে। পুরানো শাড়ীর পাড় থেকে তোলা সাদা ও রঙ্গীন সুতা পুরানো নকশীকাঁথায় ব্যবহৃত হত। কখনো কখনো কিছু নতুন সুতাও ব্যবহৃত হয়। পুরানো কাঁথাগুলোতে (একশ বছরের) সাদা, কালো, নীল, লাল এই চার রঙ্গের সুতা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ের কাঁথাগুলোতে অর্থ্যাৎ ১৯৫০ পর্যন্ত সময়ের কাঁথায় এরও অতিরিক্ত রঙ্গের সুতা ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, হলুদ, কমলা, সবুজ, খয়েরি, বেগুনী। আরো পরের কাঁথায় অর্থাৎ বর্তমান সময় পর্যন্ত নকশী কাঁথায় সুতা ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। নকশীকাঁথায় পুরানোশাড়ীর পাড়ের সুতার বদলে নতুন সুতা ব্যবহার হয়েছে, সেই সংগে রেশমি এমব্রয়ডারী সুতা, এমনকি রঙ্গীন চিকন উলও নকশীকাঁথায় সুতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতি সম্প্রতি স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পর থেকে এদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন নারী সমিতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক নকশীকাঁথা তৈরি করাচ্ছে। সেসব কাঁথায় নতুন কাপড় ধুয়ে নতুন রঙ্গীন সুতার পাশাপাশি জমিনে চিত্রগুণ ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে কাঁথা সেলাইকাজে বিদেশী এমব্রয়ডারী রেশমী রঙ্গীন সুতা সরবরাহ করে এবং উদ্যোগী সংস্থার ফরমায়েসে নকশীকাঁথা মেয়েরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য তৈরি করে।

নকশীকাঁথা তৈরিতে সুই এর ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই এতদাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। প্রত্মতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে তা জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে কমলা দেবী চট্টপাধ্যায় বলছেন, "Excavations have revealed bronze embroidery needles dating back to 2300-, 1500 B.C. as also figurines wearing emberoidered drapery. Similar embroidered textiles can also be seen in the ancient Buddhist stupa sculptures" (Kamaladevi)[২৭] এবং রিগবেদেও সেলাই ও নকশা কাজে সুই এর ব্যবহারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসংগে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ ও পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর প্রাচীনতম সুতা বস্ত্র, বয়ন অঞ্চলগুলোর অন্যতম বাংলাদেশেও প্রাচীনকাল থেকে সুতার কাপড়ে সেলাই কাজে সুই এর ব্যবহার চলে আসছে। বর্তমানেও ব্যবসাদারী আধুনিক নকশীকাঁথা সেলাইয়ের কাজে মেয়েরা এক এবং অভিন্ন সুই এর ব্যবহার করছে।

কলা কৌশল

বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টি ও কলাকৌশল প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ বোয়াসের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "Productive artists are found among those who have mastered a technique "(Boas : 1927)[২৮]।

লোকজীবনধারায় ঐতিহ্যের, বংশ পরম্পরায়ের নকশীকাঁথা সৃষ্টির কৌশল, দক্ষতার উত্তরাধিকারী এদেশের গ্রামের মেয়েরা নকশীকাঁথা সেলাই করে। পুরানো কাপড় সেলাই করে নকশীকাঁথা তৈরি করা হয়। অর্থাৎ কাঁচামাল পুরানো কাপড় নকশীকাঁথায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের লোকজীবনধারায় গ্রামেরমানুষ– মেয়েদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মত নকশীকাঁথাও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের বলে পরিগণিত হয়। ফলে নকশীকাঁথার সেলাই কাজটি একটি কৌশল বলে পরিগণিত হয়েছে। যা একান্ত বাংলাদেশের, এই কৌশল সেলাই, ফোড় নকশী কাঁথার বিচিত্র মোটিফ সৃষ্টির মূল নিয়ামক। এ জন্য প্রতিটি মোটিফে একদিকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় দিক বিধৃত, অপরদিকে ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যময় সেলাই কৌশল ও দক্ষতা সম্পৃক্ত। মূলতঃ এ কারণেই নকশীকাঁথার প্রতিটি মোটিফের নাম স্থানিক ও কালিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে বহু নামের বৈশিষ্ট্যের সেলাই, ফোড় স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে পরিচিত হয়েছে। এক একটি অঞ্চলের মেয়েদের সেলাইয়ের ফোড় বৈচিত্রময় মোটিফ তৈরির জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। অঞ্চলের বৈশিষ্ট, লোক সাহিত্য, লোকবিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মেয়েদের বৈশিষ্ট্যময় কৌশল সেলাই বা ফোড়ের নাম হয়েছে লোকসমাজের সার্বজনীন নাম লিকফোড়, পাটিফোড়, চাটাইফোড়, ক্যাত্যাফোড়, ভরাটফোড়, বেকী, দোফড়া, তাড়াজোড়াফোড়, পাটি বান্ধা ফোড়। এসব ফোড়ে অঞ্চলভেদে বিশেষ অঞ্চল বিশেষ ধরনের মোটিফ তৈরির উপযোগী বলে সনাক্ত হয়েছে। স্থানীয় কৌশল নকশী কাঁথাকে বৈশিষ্ট্যময় করেছে। কখনো কখনো একই চিত্রগুণ সম্পন্ন মোটিফ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। (তোফায়েল ঃ ১৯৯৫)[১৯]। একটি ছবি আঁকতে শিল্পীর যেমন প্রয়োজন রংএর তেমনি নকশী কাঁথার শিল্পী গ্রামের মেয়েদের প্রয়োজন হয় প্রচলিত ঐতিহ্যের কৌশল সেলাই বা ফোড়ের মাধ্যমে মোটিফ গড়ে রং ও রেখা সৃষ্টি করা। এ কারণেই কৌশলের, ফোড়ের এত নাম।

ফোড়ের সাহায্যেই মোটিফ তৈরি হয়। তৈরি হয় তাগা, সারি, পাড়, লাইন, কিনারা, আচলা। বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচিত্র নামে উল্লিখিত সারি, লাইন, তাগার নাম পাওয়া যায় যেমন আনাজ তাগা, তাবিজ পাড়, শামুক তাগা, শাড়ীর পাড়, পিপড়ার সারি, ফুলপাড়, পাঁচ তাগা, নোলক তাগা, মইতাগা, মালাতাগা, মাছতাগা, ঝোপতাগা, চোখপাড়, চিক তাগা, বিছাতাগা, বিছাপাড়। এসব লাইন, সারি নকশী কাঁথার কেন্দ্রীয় মোটিফকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্ব, মর্যাদা এবং জমিনে মোটিফগুলোকে চিত্রগুণ প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া যেসব অপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটিফ দিয়ে নকশীকাঁথার জমিনে চিত্রগুণ ও বুণটগুণে বৈচিত্র আনা হয় সেগুলো হচ্ছে মুশুরী, মটরদানা, কবুতরখুপী, গোলক ধাধা, ধানেরশীষ, বরফী, সখী, শংখলতা, মোচড়া ফুল, মাকড়শা, জিলাফি, বাঘেরপারা, ইত্যাদি। এসব মোটিফের নাম এদেশের লোকজীবনধারায় অতি পরিচিত।

নকশী কাঁথার সৃষ্টিতে বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েরা অনুভব ও চেতনায় ঐতিহ্যের কৌশল সেলাইয়ের ফোড়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটিফ, লাইন বা সারি মোটিফ, চিত্রমোটিফ এবং কেন্দ্রীয় মোটিফ উদ্ভাবন করে। নকশীকাঁথাসেলাই ঐতিহ্যের কৌশল। ঐতিহ্যিক লোকসমাজের বহুমাত্রিক রূপ এই সেলাই কাজকে লোক সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিণত করেছে কারণ প্রতিটি মোটিফে লোকজীবনধারার-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান সক্রিয়।

আধুনিকতা, নগরজীবন এবং গণমাধ্যমসমূহের প্রভাবে গ্রামীণ লোক-সমাজের ঐতিহ্যিক প্রবহমান ধারায় রূপান্তর ঘটছে প্রতিনিয়ত। যে লোকসমাজ ঐতিহ্যের লোকশিল্প নকশীকাথা সেলাই ও ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা করত সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য এখন প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে গ্রামের মেয়েরা আগের মত নকশীকাঁথা সেলাই করতে সময় দিতে পারছেনা। অখন্ড অবসর এখন আর নেই। এখন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও কারুশিল্প ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা ও রপ্তানীর উদ্দেশ্যে গ্রামের দুস্থ, অভাবী মহিলাদের পূনর্বাসনের কার্যক্রম নিয়ে নতুন নকশীকাঁথা সেলাইয়ের পরিকল্পনায় উল্লিখিত ধরনের সংস্থাসমূহ যাদুঘরে সংগৃহীত পুরানো কাঁথার মূল্যবান নিদর্শনের মোটিফ সমূহ থেকে বাছাই, নকল করে, কখনো আংশিক আকর্ষণীয় মোটিফ অবিকল নকল করে নতুন কাঁথা তৈরি করাচ্ছে। এসব নতুন কাঁথা কোন অঞ্চলের, বৈশিষ্ট্যের, কোন নির্দিষ্ট কাঁথাকে নকল করা হয়েছে তা সনাক্ত করার উপায় নেই। নতুন কাঁথায় বিভিন্ন অঞ্চলের কাঁথার মোটিফ কেবল অলংকরণের জন্য সেলাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ক্ষেত্রে সেলাইয়ের কৌশলেও সঠিকভাবে ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করা হয় না। দেশীয় লোকজ ঐতিহ্যের সেলাই ফোড়ের সংগে বিদেশী সেলাই কৌশলও অনুসৃত হয়েছে। যেমন কাশ্মীরী শালের সেলাই কৌশল। এছাড়া ইউরোপীয় রীতির সেলাই কৌশল নতুন ব্যবসাদারী কাঁথাগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরানো কাঁথা থেকে নতুন কাঁথায় রূপান্তর ঘটেছে, পার্থক্য সূচিত হয়েছে এভাবে।

এভাবে কালিক ব্যবধানে ঐতিহ্যের নকশীকাঁথার সেলাই কৌশলে পরিবর্তন লক্ষণীয়। অতীত থেকে বর্তমানের কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ভবিষ্যতে রূপান্তরের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। ধারাবাহিকতা রক্ষিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এদেশের ঐতিহ্যের নকশীকাঁথার সেলাই কৌশল। এ প্রসংগে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মীর মতামত "But once we knew the women possessed the skill and sharedtradition, although the link with the new designed Kantha had been broken, we started the Kantha revival scheme" (Chen : 1984)[২০]। এতেই প্রতীয়মান হয় যে নকশীকাঁথা সেলাইয়ের কৌশল এদেশের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য

সাংস্কৃতিক উপাদান বলে এর প্রবহমান ধারা কালিক ব্যবধানে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় অতীত থেকে বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবেই ভবিষ্যতেও অব্যাহতভাবে রূপান্তরিত হতে থাকবে।

নকশী কাঁথার ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকজীবন ধারার প্রয়োজন, উপযোগিতার নিরিখেই নকশীকাঁথার উদ্ভব এবং অনিবার্যভাবে নকশীকাঁথা এদেশের লোক সংস্কৃতির উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যের বলে পরিগণিত হয়েছে। এবং নকশীকাঁথার ব্যবহারের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে নাম, বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়েছে। নকশী কাঁথার বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের জীবনধারা-লোকসংস্কৃতির। ঐতিহ্যের পুরানো নকশীকাঁথা প্রধানত ছিল নকশী কাঁথা, আসন কাঁথা, লেপ কাঁথা, নকশী থলে, আরশি লতা, বালিশের ঢাকনা, পান-সুপারি রাখার খিচা, ফকিরের ভিক্ষার ঝুলি, সারিন্দা দোতরা রাখার আবরণী, বায়তন, প্রত্যেক ধরনের কাঁথার নাম লোকজীবন ধারায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নকশীকাথা বস্তুটির কোন নির্দিষ্ট ব্যবহারকে নির্দেশ করছে। আবহমান বাংলার লোকজীবনের সাধারণ মানুষের অনুভব, ভাষা নকশী কাঁথার উল্লিখিত নামকরণ করেছে। অঞ্চল ভেদে প্রতিটি নামেরও ভিন্নতা, বৈচিত্র লক্ষ্যণীয়। উল্লিখিত নামের কাঁথাগুলো প্রাচীন ধারার।

এদেশে মুসলমানদের আগমন অর্থাৎ আরব মুসলিম ব্যবসায়ী, পীর, ফকিরদের বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং স্বাধীন সুলতানী ও মোগল শাসন ও ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারা এদেশের গ্রামীণ লোক জীবনধারা-লোক সংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলে। ইসলামীসংস্কৃতিধারা বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজের লোকসংস্কৃতির উপাদান-লোক ও কারুশিল্পে প্রতিফলিত হয়। সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নানা প্রভাব, অনুষঙ্গ বাংলাদেশের লোকজীবনের সংস্কৃতিতে, লোক ও কারুশিল্পে স্থান করে নেয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সংস্কৃতি পরিবেশে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে। আমাদের লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান যেমন নকশীকাঁথা সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় কালিক ব্যবধানে রূপান্তরিত হয় ব্যবহারে, নামে। নকশীকাঁথার পুরানো ধারায় রূপান্তর ঘটে। নকশীকাঁথার জগতে স্থান করে নেয়। পরিণত হয় লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানে, পরিবেশে। যেমন দস্তরখান, জায়নামাজ, কোরাণ শরীফের গিলাফ, কবর বা মাজারের ঢাকনা, গিলাফ, রুমাল, বর্তন ঢাকনী, তসবীর থলিয়া নকশীকাঁথা এসব রূপ, গড়ন ও বৈশিষ্ট্যে এবং নামে রূপান্তরিত হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথা-বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদানের এই

রূপান্তর হয়েছে। ইসলামীসংস্কৃতি ও জীবন ধারার প্রয়োজন মেটাতে নকশীকাঁথায় নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভাবন হয়েছে। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথায় এই রূপান্তর ঘটেছে।

পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৮০র পরে নকশী কাঁথার ব্যবহারে আরো রূপান্তর ঘটে। আধুনিক কনজুমার সমাজ, পর্যটন, আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের প্রভাবে সারা বিশ্বে লোকসংস্কৃতির জগৎ ও লোকসমাজের জীবনধারায় ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। এ সবের প্রভাব লোকসংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে পড়ে। ফলে আবহমান বাংলার লোক সমাজের সংস্কৃতির উপাদান বাংলার নিভৃত পল্লীর জীবনধারার ব্যবহারের জিনিস নকশীকাঁথা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিক নগর জীবনের, শখের, রুচির, আধুনিক নানা জিনিসে যেমন মেয়েদের আধুনিক ফ্যাশনের পোষাক পরিচ্ছদ, শাড়ী, ভ্যানিটি ব্যাগ, অলংকার বাক্স, চশমার বাক্স, ওয়েস্টকোট, দেয়ালের শোভাবর্ধনকারী ফ্রেমকাঁথা, নানা ধরনের হাত ব্যাগ, ব্রীফকেস, মেয়েদেরশাল, বিছানার আধুনিক চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি। পুরানো মোটিফের সংগে নতুন আধুনিক মোটিফ, কখনো বিদেশী মোটিফে নকশীকাঁথার ঐতিহ্য-কৌশল, দক্ষতার সাহায্যে তৈরি নকশীকাঁথাকে একটি মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত জিনিসসমূহ তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন এসেছে, নকশীকাঁথা রূপান্তরিত হয়েছে নবরূপে ও বৈশিষ্ট্যে।

বোধকরি পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ আধুনিক নগরজীবনের প্রভাবে বাংলাদেশের নকশী কাঁথার মত একটি লোকসাংস্কৃতিক উপাদান সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন নতুন ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে উল্লিখিত জিনিসে পরিণত হয়ে নকশীকাঁথা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য সচল রয়েছে।

নকশী কাঁথায় মোটিফের ব্যবহার

গ্রামের মেয়েরা নকশী কাঁথার রূপকার, শিল্পী। বাংলাদেশের লোক জীবনধারা-লোকসংস্কৃতি এদেশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবনধারার সমন্বয়ে সৃষ্টি ও বিকশিত হয়েছে। আবহমান বাংলার এই জীবনধারায় সম্পৃক্ত এদেশের মেয়েরা তাদের অনুভব ও চেতনায় যে সব চিত্রকল্প সহজে, অবলীলাক্রমে নির্মাণ করতে পারেন তা-ই নকশী কাঁথায় সেলাইয়ের সাহায্যে রং বেরং নকশার, চিত্রগুণের মোটিফে ফুটিয়ে তোলে। ফলে নকশী কাঁথার এক একটি মোটিফ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান, সংস্কৃতি পরিবেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, লোকজীবন ধারা এবং প্রতিবেশকেন্দ্রিক মোটিফসমূহের সাধারণ অনাড়ম্বর চিত্রগত অবস্থান, সজ্জা নকশী কাঁথার জমিনকে লোকজীবনের, জীবনধারার দলিলে পরিণত করেছে।

মোটিফ সম্পর্কে Encyclopaedia of Anthropology তে উল্লেখ করা হয়েছে "A motif is regularly recurrent thematic element in a body of art or folklore"[২১] এখানে Thematic element বলতে মোটিফের বিষয়বস্তু, বক্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নকশীকাঁথার মোটিফের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যগুলো ধর্মীয় লৌকিক সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান, পারিপার্শিক পরিবেশ ভূদৃশ্য ও গার্হস্থ্য জীবনের খুটিনাটি এবং শিল্পীর সমসাময়িক কালের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। এবং এসবের চিত্রগত রূপই হচ্ছে মোটিফ। এসব বিষয়বস্তু ও বক্তব্যকেন্দ্রক কেন্দ্রীয় মোটিফগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে, দৃশ্যমান করতে পরিপূর্ণ নকশার জমিন সৃষ্টিতে অপ্রধান মোটিফ-নকশাও শিল্পী সৃষ্টি করেন। এগুলোও কেন্দ্রীয় মোটিফের বৈশিষ্টের মত পৌন;পুনিক। এতে বক্তব্য, বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত থাকে না। তবে অপ্রধান মোটিফগুলো কেন্দ্রীয় মোটিফের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনে, সম্পূর্ণতাদানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে, সহায়ক মোটিফ হিসেবে। এ জন্য এ সব মোটিফকে অপ্রধান বা সহায়ক মোটিফও বলা যেতে পারে। এ সব সহায়ক মোটিফ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মোটিফের সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য এবং চমৎকার করা এবং একান্ত মোটিফ সর্ম্পক্ত বলেই এগুলোকে অপ্রধান বা সহায়ক মোটিফ বলা যায়।

পুরানো নকশী কাঁথার মোটিফ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নকশী কাঁথায় সাধারণতঃ জমিনের মাঝখানে একটি কেন্দ্রীয় অলংকৃত পদ্ম বা পদ্ম সমষ্টি এবং চার কোনায় চারটি জীবনবৃক্ষ কোনাকুনিভাবে শোভা পায়। কখনো কেন্দ্রীয় মোটিফ কেবল জীবনবৃক্ষ, এ ধরনের নকশীকাঁথাও দেখা গেছে এবং জমিনে কেন্দ্রীয় মোটিফ স্থাপনের পর অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গায় অসংখ্য, বিচিত্র ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রধান মোটিফ শোভা পায়। আর একটি পদ্ধতি, যা নকশীকাঁথায় সেলাইয়ের সাহায্যে পুরানো শাড়ীর পাড়ের নকশার পুনরাবৃত্তিকরণ। পুরানো নকশী কাঁথার মোটিফগুলো নানাশ্রেণীর (১) লোকজ বিশ্বাস, ধর্মীয় ঃ পদ্ম, সূর্য, পানি, মাছ, রথ, পৃথিবী, জীবনবৃক্ষ, (২) একান্ত মেয়েদের ব্যবহার্যঃ আয়না, চিরুনী, অলংকার, আলতা, (৩) রান্না ঘরের জিনিসপত্র ঃ হাড়ি বাসন, দাও, বটি, সরতা, হাতা, চালনি, (৪) কৃষি সরঞ্জাম ঃ কুলা, ঢেকী, কাইল, কাচি, দাও, (৫) প্রকৃতি বিষয়ক ঃ গাছ, লতাপাতা, ফুল, পাখি, ঘোড়া, বিড়াল, পেঁচা, (৬) উৎসব চিত্র ঃ বিয়ের বরযাত্রী, পালকীতে নতুন বউ, রথযাত্রা, নৃত্যরত নরনারী, শিকারী।

এসব মোটিফের সাধারণ প্রচলিত সংস্থাপন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নকশীকাঁথা তৈরি হলেও এতে স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে সকল ধরনের নকশীকাঁথায় বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গার্হস্থ জীবনের, প্রকৃতির পরিবেশকে গ্রামের সাধারণ মেয়েরা ঐতিহ্যিক ধারায় মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টির মোটিফ, নকশা, চিত্র আকেন রঙ্গীন সুতায় সেলাইয়ের মাধ্যমে।

নকশীকাঁথায় ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় মোটিফ অষ্টদল, শতদল, সহস্র দল পদ্ম প্রাচীন ধারার। এতে লোকজ, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পৃক্ত হয়েছে। এছাড়া এই মোটিফের প্রাচীনত্ব সিন্ধু সভ্যতার সময়কালের বলে পন্ডিতদের ধারণা। পরবর্তীকালে কেবল বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান যোগ হয়ে এই প্রাচীন মোটিফটির নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। (Gurusaday : 1990)।[২২]

পরবর্তীতে কালিক ব্যবধানে প্রাচীন মোটিফ বৈশিষ্ট্যের কাঁথায় হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের তেরি নকশী কাঁথায় মোটিফের ব্যবহারে পার্থক্য সূচীত হয়। যেমন হিন্দু মেয়েরা যেখানে অষ্টদল, শতদল বা সহস্রদল কেন্দ্রীয় মোটিফকে বৃত্তাকারে ঘিরে জীবজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টির জন্য জন্তু, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, গার্হস্থ জিনিস পত্রের মোটিফ সৃষ্টি করেন, সেক্ষেত্রে মুসল্মমান মেয়েরা জীবজন্তু বা মানুষের পরিবর্তে চন্দ্র, সূর্য, তারা, নক্ষত্র, লতাপাতা ইত্যাদি মোটিফগুলোকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া যেখানে হিন্দু মেয়েদের তৈরি নকশীকাঁথায় মন্দির, রথ, রাধাকৃষ্ণ, ত্রিশূল, সংখ, লক্ষীর পা, গদা, চক্র ইত্যাদি মোটিফ নকশীকাঁথায় শোভা পায়, সেক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েরা কাঁথায় মিনার, ঈদের চাঁদ, মেহরাব, মসজিদ, মোহররমের তাজিয়া ইত্যাদি ইসলামী মোটিফ ফুটিয়ে তোলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মেহরাব, মিনার ও চাঁদতারার মোটিফসমৃদ্ধ জায়নামাজের কাঁথার উদ্ভব হয়েছে এবং পরিণত হয়েছে বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানে। কলকা ও জীবনবৃক্ষ মোটিফটি পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে পরবর্তীকালে এদেশের নকশীকাঁথায় মোটিফ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথায় ব্যবহৃত এই বিদেশী মোটিফ দু'টি বয়ন ও কার্পেট, শাল থেকে নেয়া হয়েছে বলেও পণ্ডিতগণের অনুমান।

দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালে গ্রামের মেয়েদের নকশীকাঁথায় ইংরেজ শাসকশ্রেণীর অনেক ছবি, স্মৃতি মোটিফ হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন শোলার হ্যাট কোট পড়া গোড়া সাহেব, ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন সাহেব। এছাড়া এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি নতুন নতুন অপ্রচলিত মোটিফ গ্রামের মেয়েরা ব্যবহার করে নকশীকাঁথায় মোটিফের ব্যবহারে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরানো ঐতিহ্যের নকশীকাঁথায় মোটিফের বৈশিষ্ট্য অষ্টদল, শতদল এবং সহস্রদলপদ্ম এবং জীবনবৃক্ষের পাশাপাশি উপরোক্ত অপ্রচলিত নতুন ধরনের মোটিফ সৃষ্টি করে গ্রামের মেয়েরা নকশীকাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে ।

শৈল্পিক

লোকজীবনধারায় প্রকৃতি-পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমারেখায় মানুষ জীবনের প্রয়োজনে অনুভব ও চেতনায় বস্তু নির্মাণ করে। বস্তু পরিণত হয় লোক ও কারুশিল্পে। উপযোগিতা থেকে সৌন্দর্যের বলে বিবেচিত হয় রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। মূলতঃ আদিম

সমাজ থেকে লোকসমাজের জীবনধারার সকল স্তরেই মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা উপকরণের মৌলিক গড়ন, নকশা, নকশাগুণ, ও বৈশিষ্ট্যকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টিতে প্রয়োগ করে। বোধকরি প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ অবদান লোক ও কারুশিল্প। এভাবেও বলা যায়, লোক ও কারুশিল্পের রূপ ও নকশা নির্মাণের চিত্রকল্প লোকশিল্পী গ্রহণ করে তার চার পাশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। ফলে আদিম সমাজ থেকে লোকসমাজ সকল স্তরের জীবনধারায় মানুষ প্রকৃতির উপকরণের মধ্যে যে ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, (Balance) প্রতিসমগুণ (Symmetry) এবং ছন্দ (rhythm) রয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রতিদিনের জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরিতে তা প্রয়োগ করেছে। ফলে তৈরি বস্তু লোককারুশিল্পে আপনা থেকেই ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ এবং ছন্দ থাকে। এ ক্ষমতা, গুণ মানুষের স্বাভাবিক অনুভব ও চেতনা সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক মরিস বলেছেন "If decorative art is a universal feature of human cultures, it may be that a feeling for balance, symmetry and rhythm was inherited from our prehominid ancestors (Morris: 1962)।[২৩]

বাংলাদেশের লোকজীবনের গ্রামীণ মেয়েরা প্রকৃতির মধ্যে যে সব মৌলিক গড়ন, নকশা, নকশাগুণ রয়েছে তার প্রতিফলন নকশী কাঁথায় সেলাইয়ে ফুটিয়ে তোলে। ফলে নকশী কাঁথায় গাছ পালা, আকাশে চাঁদ, সূর্য, তারা, জীবজগতের অবয়ব, কাঠামোর রূপ, গড়নের ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ এবং ছন্দ গুণ গ্রামের লোক শিল্পী-মেয়েরা তাদের অনুভব ও চেতনায় সনাক্ত এবং আবিস্কার করে নকশী কাঁথায় প্রয়োগ করে তা শৈল্পিক সৃষ্টিতে পরিণত করে। যেমন সুসামঞ্জস্য গুণের এবং সমভাবে বিন্যস্ত কোন চিত্রকল্পের ধারণা করলেই দ্বিমুখী, দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমতার গুণাবলী কোন কিছু আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। ফ্রান্স বোয়াজ এ সম্পর্কে বলেছেন যে কোন কালের মানুষের সৃষ্টি নকশী কাজের সরলতম উদাহরণেও উল্লিখিত ধরণের নকশা দেখা যায়। মূলতঃ মানুষের শরীরের গঠনেই দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমগুণের নকশা ধারণ করে আছে। (Boas : 1927)।[২৪] মানুষকে তার অনুভূতির ডান ও বাম পার্শ্বের গতিশীলতা দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমগুণের অনুভূতির দিকে অগ্রসর করায়। এই অনুভূতি যে কোন ধরনের নকশা কাজে মানুষ ব্যবহার করে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, আনন্দিত হয়। এভাবেই নকশীকাঁথায় দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমগুণের নকশাবলী বাংলার গ্রামের সাধারণ মেয়েরা ফুটিয়ে তুলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টির, তৈরির প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ নকশার ইঙ্গিত দেয় অথবা আপনা থেকেই নকশা আরোপিত হয়ে থাকে। যেমন বাঁশ-বেতের ঝুড়ি বোনা কাজে। ঝুড়িবোনা কাজে দুই রঙের আঁশ যখন চেক পদ্ধতিতে (Check Work) একত্রে মেশে তখন আপনা থেকেই দাবার বোর্ডের নকশা সৃষ্টি হয়ে যায়। টুইল পদ্ধতিতে বোনা হলে উদ্ভাবিত হয় তির্যক সরুডোরা দাগ। তীর্যক ডোরা দাগ পরিণত করে হিরক, রহিতন গড়নের নকশায় (Lowie 1940 : 182)

অনুরূপভাবে নকশীকাঁথায় সেলাই কাজটিই নকশা, মোটিফ হয়ে যায়। যেমন মোটর দানা, পিপড়ার সারি, নদীর ঢেউ ইত্যাদি। কারণ রঙীন সুতায় যখন কেবল কাঁথাটি তৈরির কৌশল হিসেবে মেয়েরা কাঁথায় খাড়াভাবে সেলাই, ফোড় দিয়ে সেলাই সম্পন্ন করার পর দেখা যায় সেলাইয়ের, ফোড়ের গতিতে সুসামঞ্জস্যতা এবং ছন্দ এসেছে। আপনা থেকে নানা নকশার মোটিফের উদ্ভাবন ঘটায়, সৃষ্টি হয়। স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে শিল্পী গ্রামের মেয়ে, তার সমাজ, প্রকৃতি, পরিবেশের উপাদান সদৃশ্য চিত্রকল্প নির্ধারণ করে মোটিফ, নকশা নির্দিষ্ট করে নামকরণ করে।

এছাড়া ছন্দময় পুনরাবৃত্তি এই অনুভূতি দ্বারাও মানুষ নকশা সৃষ্টি করে। মৃৎপাত্র, ঝুড়ি, বস্ত্রের অলংকরণ ও ভূষণের মত নকশীকাঁথার নকশা পরিকল্পনায় ছন্দময় পুনরাবৃত্তি দৃষ্টিগোচর, দৃশ্যমান হয়। মানুষের অনুভূতি ও চেতনায় ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ এবং ছন্দের চিত্রকল্প ক্রিয়াশীল। ফলে মানুষের হাতে তৈরি, সৃষ্টি যে কোন বস্তু, জিনিস, লোকশিল্প, কারুশিল্পে অনিবার্যভাবে ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ এবং ছন্দকে খুঁজে পাই। এবং ছন্দময় পুনরাবৃত্তি, এই অনুভূতি, চেতনা দ্বারাও মানুষ নকশা সৃষ্টি করে। মৃৎপাত্র, ঝুড়ি, বস্ত্রের অলংকরণ, ভূষণের মত নকশীকাঁথার নকশা পরিকল্পনায় মোটিফ, নকশার ছন্দময় পুনরাবৃত্তিও দৃষ্টিগোচর, দৃশ্যমান হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি নকশীকাঁথার জমিনে এদেশের মেয়েরা নকশা পরিকল্পনায় মোটিফ স্থাপনে ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে, পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ছন্দ সৃষ্টি করে। হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের, বৈশিষ্ট্যের নকশীকাঁথা। লোক ও কারুশিল্পের নকশা বিশ্বজনীন। চিরায়ত বৈশিষ্ট্য ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ এবং ছন্দ সৃষ্টিতে শিল্পী দৃষ্টিসংক্রান্ত (Visual) উপাদানসমূহ যেমন গড়ন, আকার (form), রেখা (line), রং (Colour) এবং জমিন (space) কে ব্যবহার করেন। সৃষ্টি হয় নকশা সমৃদ্ধ লোক ও কারুশিল্প। মূলতঃ নকশা হচ্ছে শিল্পকলা, সৌন্দর্যের ভাষা।

বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েরা নকশীকাঁথায় অনুরূপভাবে এদেশের লোকজীবন ধারার অনুষঙ্গ প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন যাপনের নিরিখে ভারসাম্যের সুসাম্যঞ্জস্যতা, প্রতিসম এবং ছন্দগুণের নকশা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের রূপকল্প নকশীকাঁথার নকশায় বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েদের অনুভব ও চেতনার শৈল্পিক সৃষ্টি নকশীকাঁথায় বিধৃত। নকশার পরিকল্পনা একান্ত বাংলাদেশের, এদেশের সংস্কৃতির। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী ও ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানের ফরমায়েসী, আধুনিকশিল্পীদের নকশা করা আধুনিক নকশীকাঁথায় পুরানো ঐতিহ্যর নকশা পদ্ধতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিদেশী ট্যাপিস্ট্রি ধারার নকশীকাঁথা সেলাই করা হয়। অথচ নকশীকাঁথা নামেই দেশে ও বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়। এসব নকশীকাঁথায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের ধারায় ছেদ পড়েছে। একটি নতুন

রূপান্তরিত রূপে নকশীকাঁথার সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক পেইন্টিং এর অনুরূপ। আধুনিক পেইন্টিং এর মতই এসব নকশীকাঁথায় ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে রঙীন রেশমী সুতা ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রেমের পেইন্টিং এর মত নকশীকাঁথা নীচ থেকে উপরে অর্থাৎ জমিন থেকে আকাশ দেখানো হয়েছে। এসবই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথা রূপান্তরিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক

নকশীকাঁথা সেলাইয়ের শিল্পী গ্রামের মেয়েরা। গ্রামের মেয়েদের তৈরি বস্তু, জিনিস-নকশীকাঁথা প্রয়োজনের। তবে অন্যান্য কারুশিল্পের মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে নকশীকাঁথার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিলনা। কারণ নকশীকাঁথা ব্যবসায়িক কেনা-বেচায় প্রাচীনকাল থেকে এমনকি ৭০ এর দশক পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। অন্তপুরের নারী তার কাজের অবসরে বিশেষ করে বর্ষার কালে একান্তই নিজ সংসারের শিশু, প্রিয়জনের বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য নকশীকাঁথা সেলাই করতো। এ প্রসংগে দিনেশচন্দ্র সেনের মতামত "কখনো কখনো স্নেহ ও ভালবাসা ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়েছে। স্বামী ও পুত্রকে দিবার জন্য রমনীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাঁথা সেলাই করতেন"। (দিনেশচন্দ্র সেনঃ ১৯৩৯)[২৫]। ফলে গ্রামীণ লোকজীবনে, লোকমেলায়, হাটে, বাজারে নকশীকাঁথা কখনো কেনা বেচা হয়নি। কেবল পরিবারের প্রয়োজনেই নারী নকশীকাঁথা সেলাই করেছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে নারী পরিবারের সদস্যদের জন্য কাঁথা তৈরি করলেও প্রতিটি কাঁথা কিন্তু নকশী কাঁথায় পরিণত করেনি। অতি আপন মর্যাদার, ভালবাসার, স্নেহের জনকে নারী হৃদয়ের সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে উজাড় করে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে নকশীকাঁথাকে বেছে নিয়েছিল। এজন্যই নকশীকাঁথায় কখনো কখনো শিল্পী যাকে নকশীকাঁথা উপহার দেন তার নাম রঙীন সুতায় লেখেন। এছাড়া নকশীকাঁথা ভালোবাসার, মর্যাদার, স্নেহের উপহারের বস্তু হিসেবে বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত। নকশীকাঁথা বাংলাদেশের অন্যান্য কারুশিল্পের মত কুটিরশিল্প পর্যায়েও কখনো বিস্তার লাভ করেনি। নকশীকাঁথা বাংলার নারীর শিল্পবোধ ও চেতনার ফসল। এ প্রসঙ্গে কারুশিল্পের জনৈকা সংগঠকের মতামত "Kantha stitching is an in expensive hobby. But a highly specialized art where sentiment, philosophy, and romance play important roles" (Nag : 1982)।[২৬] বোধকরি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নকশীকাঁথা আমাদের লোক সমাজের নারীদের অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি, প্রতিটি নকশীকাঁথা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের, শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ও চেতনার।

নকশীকাঁথায় লোকজীবন ধারার বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক উপাদান-নারীর সৌন্দর্য অনুভূতি ও শিল্পবোধই অধিক ক্রিয়াশীল। ফলে নকশীকাঁথা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বাংলার লোক সমাজে কখনো চিহ্নিত হয়নি। নকশীকাঁথা ছিল একান্তই অন্তপুরের, নকশীকাঁথা তৈরির উপকরণের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের প্রচলিত কৌশল এই লোক কারুশিল্পটিকে ব্যবসায়িক থেকে দূরে রেখেছিল।

কালিক ব্যবধানে অন্য বিদেশী শাসকের সংস্কৃতির নানা উপাদান, অবস্থার প্রভাবে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ ও পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে রূপান্তরিত হয়ে প্রবহমান, অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে গত একশ বছরে আধুনিক প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম সমূহের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে অনেক দেশের জাতীয়সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানে অনুরূপ রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে। রূপান্তরের ধারায় তুলনামূলকভাবে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হয়। দ্রুতগতির রূপান্তর ঘটে। আধুনিক নগরজীবনের কনজুমার সমাজের প্রভাব ও প্রয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও অনুরূপভাবে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের ধারায় রূপান্তর প্রক্রিয়াটি গেল কুড়ি বছরে অধিকতর দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সাংস্কৃতিক জাতিতাত্ত্বিক। আন্তর্জাতকি কনজুমার সমাজ ও আধুনিক নগরজীবনের প্রভাবে নকশীকাঁথা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় লোক সমাজের শিল্পকলার নিদর্শন থেকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত হয়েছে।

লোকজীবনের-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান নকশীকাঁথাও কালিক ব্যবধানে পরিবর্তিত রূপে, বৈশিষ্ট্যে নগরজীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পণ্যে। পশ্চিমা উন্নত দেশের নগর সমাজ, উপজাতীয় এবং অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশের সাধারণ মানুষের লোকজ ঐতিহ্যের শিল্পকলা-লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ দেখিয়েছে এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে পর্যটনের পণ্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের শিল্পকলাসমূহ ক্রমশ উন্নত দেশের বাজারের উপহার পণ্য হিসেবে জনপ্রিয়তা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর লোকশিল্পের জিনিসের বিদেশে উপহার পণ্য হিসেবে চাহিদা বাড়ায় বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে লোকশিল্পের, কারুশিল্পের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর ক্রেতা, ভোক্তাদের জীবনধারার চাহিদা, রুচিমাফিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা তৈরিতে, গড়ণে, নকশায়, ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের দ্রুত রূপান্তর ঘটে।

এই পর্যায়ে নকশী কাঁথার রূপান্তর ঘটেছে সবচেয়ে বেশী এবং পশ্চিমা দেশের বাজার, ভোক্তাদের চাহিদা, রুচি মেটাতে গিয়ে আমাদের দেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নকশী কাঁথার মত গ্রামীণ লোকশিল্পকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করেছে। পশ্চিমা দেশের রুচি অনুযায়ী নকশীকাঁথা পরিণত হয়েছে দেয়ালে ঝোলানোর জন্য নকশী কাঁথার আধুনিক সংস্করণ, স্টেশনারী জিনিসপত্রে, ঘর সাজানোর টুকিটাকি, আধুনিক ফ্যাশনের, পোষাকের বস্তুতে। এবং বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে নকশীকাঁথা বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। নকশীকাঁথার এসব পণ্য এখন দেশের বুটিক শপে, উপহারের দোকানেও বিক্রি হচ্ছে। গ্রামের লোকশিল্প রূপান্তরিত হয়ে নগরজীবনের

পণ্যে পরিণত হয়েছে। এ প্রসংগে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের চিত্রও অভিন্ন "Non traditional commercial Kantha : Many items with kantha work have recently become treasured "collectable" among the urban elite. The work is usually done under the auspices of various social welfare groups working for the financial uplift of the poor, rural and slumdwelling women, and then sold it boutiques in Calcutta, objects such as placemats, shawls, and wall hanging on a brisk sale" (Nag : 1982)।[২৭]

বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে নকশীকাঁথা বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ঢাকায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসহ বড় বড় দোকানে বিক্রি হচ্ছে।

ফলে নকশীকাঁথার উৎপাদনের গতি বৃদ্ধিতে উপকরণ ও নকশা চয়নে পরিবর্তন এবং সেলাই কৌশলে নতুন তত্ত্ব, অন্য কৌশল সংযোজন হয়েছে। পুরানো কাঁথা থেকে এসব কাঁথার একটা মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এত কিছুর পরও এসব বাণিজ্যিক নকশীকাঁথায় ঐতিহ্যের পুরানো নকশী কাঁথার কতগুলো মৌলিক উপাদান, বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। যেমন এই ব্যবসার নকশীকাঁথা গ্রামের গরীব মেয়েরাই সেলাই করে। আর সেলাই কৌশল ও দক্ষতার ঐতিহ্য সক্রিয়। ফলে নকশীকাঁথায় আজ অবধি রূপান্তর ধারায় ঐতিহ্যের একটি ধারাবাহিকতা আছে। এজন্যই নকশীকাঁথার রূপান্তর ধারা প্রবহমান। ভবিষ্যতেও সচল প্রবহমান থাকতে, রূপান্তরিত হতে প্রস্তুত। শিল্পী এখানে ব্যক্তি নারী নয় আবহমান বাংলার লোকজীবন ধারার নারীসমাজের একজন। লোকজীবন ধারার অংশ নারী তার পূর্বপুরুষ প্রাচীন মাতামহীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেলাই কৌশল, মোটিফ, নির্মাণপদ্ধতি, সুতিবস্ত্রকে সম্বল করে এই রূপান্তর ধারায় ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নকশীকাঁথাকে প্রবহমান রাখবে।

শেষকথা

নকশীকাঁথা বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প। নকশীকাঁথার ঐতিহ্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান।

এদেশের প্রাকৃতিক উপকরণ, ঐতিহ্যের সেলাই কৌশল ও দক্ষতায় মেয়েদের অনুভব ও চেতনার সৃষ্টি সাংস্কৃতিক উপাদান নকশীকাঁথা কালের ব্যবধানে রুপান্তর প্রক্রিয়ায় আজঅবধি প্রবহমান। নকশীকাঁথার ক্রমপুঞ্জিত রুপান্তরিত ধারাকে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারার নিরিখে পরিচালিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, ধারায় নকশীকাঁথার মত লোককারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নলিখিত ধারায়, পদ্ধতিতে নকশীকাঁথার

ঐতিহ্যের ধারাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রবহমান রাখতে এবং স্বাভাবিক রুপান্তর প্রক্রিয়ার পথকে সুষ্ঠু, সুগম করতে পারে।

১. নকশীকাঁথার সংগ্রহ ও দলিলীকরণঃ দেশ ও বিদেশের যাদুঘরগুলোতে সংগৃহীত বাংলাদেশের ঐতিহ্যের পুরানো নকশীকাঁথার অনুপুংখ দলিলীকরণ, গবেষণা। পুরানো নকশীকাঁথা সংগ্রহ অব্যাহত রাখা। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের পুরানো কাঁথার একটি কেন্দ্রীয় সংযোজন তালিকা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সংগৃহীত নকশীকাঁথার সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সংগৃহীত কাঁথাসমূহের মোটিফ ও নকশার তালিকা তৈরি করা।

২. তিনটি শ্রেণী অনুসরণ করে নতুন নকশীকাঁথা তৈরি করা যেতে পারে।

ক) দেশের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাদুঘরগুলোতে সংগৃহীত ঐতিহ্যের প্রাচীন নকশীকাঁথা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুরানো নকশীকাঁথার অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করা যেতে পারে। এবং মূলকাঁথার উৎস বিবরণ নতুন তৈরি নকশী কাঁথায় উল্লেখ নিশ্চিত করা।

খ) আধুনিক নকশী কাঁথা। পুরানো নকশার, মোটিফের সংগে নতুন বিদেশী মোটিফের সংমিশ্রণে তৈরি আধুনিক কাঁথা।

গ) নতুন উদ্ভাবিত নকশা। আধুনিক শিল্পীদের উদ্ভাবিত নকশা অনুসরণ করে।

৩. পুরানো ও নতুন তৈরি কাঁথার একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা।

৪. উপরোল্লিখিত পদ্ধতি সমূহের সক্রিয় ও কার্যকরী কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা

আধুনিক প্রযুক্তি ও নগরকেন্দ্রিক কনজুমার সমাজের চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যময় জাতি সমূহের লোকশিল্প যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাত হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে বিশ্বের লোকশিল্প ভান্ডার সাংস্কৃতিক শিল্পে (Cultural Industries) পরিণত হতে চলেছে। (Unesco:)।[২৮] অদূর ভবিষ্যতে এই সাংস্কৃতিক শিল্পের প্রসার ও সম্ভাবনর ক্ষেত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে। সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশের রূপান্তরিত নতুন নকশীকাঁথাও আন্তর্জাতিক বাজারে সাংস্কৃতিক শিল্পে পরিণত হবে। বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক উপাদান নকশীকাঁথায় আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির উপাদান সংযোজিত হয়ে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নকশীকাঁথা ভবিষ্যতের জন্য সচল, প্রবহমান থাকতে প্রস্তুত।

তথ্য নির্দেশ

১. Encyclopaedia Brittanica, Vol-16, 1987.

২. সৈয়দ মাহবুব আলম, বাংলার বয়নশিল্প, কারুশিল্প, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর-১৯৯৩ ঃ ২৭

৩. সৈয়দ মাহবুব আলমঃ লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নঃ প্রসংগ নকশীকাঁথা, বাংলাদেশের লোকশিল্প, সোনারগাঁও, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, ১৯৮৩।

৪. Firth Raymond W. 1951 Elements of Social organization. London: Watts–A paperback edition was published in 1963 by Beacon.

৫. Leach, Edmond R. 1954 Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. A Publication of the London School of Economics and political science. Cambridge. Mass: Harvard Univ Press.

৬. Herskovitis Mellville J. 1955, Cultural Anthropology. New York: Knopf. An abridged revision of Man and his works 1948.

৭. Vogt, Evon z. 1960. On the concept of structure and Process in Cultural Anthropology. American Anthropologist New series 62. 18-33, Culture Change. Intl Encyclopaedia of the Social Sciences. 1972. Vol-3-4: 556.

৮. ডাঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নকশীকাঁথা, লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ৯৫ সম্পাদক, বজলুর রহমান ভূঁইয়া, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৫।

৯. সৈয়দ মাহবুব আলম, লোকশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম-'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, সোনার গাঁও, ঢাকা, ১৯৭৯।

১০. Zaman. Neaz. 1993. The Art of Kantha Embroidery. U. P. L. Dhaka.

১১. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার কাঁথা, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬, ১-১৩।

১২. কল্যাণ কুমার গঙ্গৌপাধ্যায়, বাংলার কাঁথা, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬, ১-১৩।

১৩. Encyclopaedia Brittanica-V0l-16. 1987.

১৪. Folk Art as Means of Rural Development : The case study of Kantha in Bangladesh: Qureshi Mahmud Shah. Folklore of Bangladesh. Edited by Shamsuzzaman Khan. Bangla Academy-1992. 32.

১৫. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার কাঁথা, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬, ১–১৩।

১৬. সৈয়দ মাহবুব আলম ঃ লোক শিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নঃ প্রসংগ নকশীকাঁথা, বাংলাদেশের লোকশিল্প, সোনারগাঁও, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, ১৯৮৩।

১৭. Chattapadhay Kamaladevi, Handicrafts of India.

১৮. Boas, Franz, Primitive Art, New York: Dover Publications (1992).

১৯. তোফায়েল আহমদ, লোকশিল্পের ভূবনে বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

২০. Chen Martha Alter, Kantha and Jamdani : Revival in Bangladesh, India International Centre Quarterly Vol-11, No-4, 1984.

২১. Encyclopaedia of Anthropology, 1992.

২২. Dutta Guru Saday, Folk Arts and crafts of Bengal : The Collected Papers, Seagull, Calcutta, 1990 : 04.

২৩. Morris Desmond 1962. The Biology of Art : A Study inthe Picture Making Behaviour of the great Apes and its Relationship to Human Art, New York : Alfred A. Knopf.

২৪. Boas, Franz, Primitive Art, New York: Dover Publications (First Published- 1927).

২৫. দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বৃহৎ বঙ্গ, ১৯৩৯।

২৬. Nag Jamuna, Alpana, Kantha and other Household Arts : The Arts of Bengal and Eastern India, Crafts Council of West Bengal Calcutta, India, 1982.

২৭. Nag Jamuna, Alpana, Kantha and other Household Arts : The Arts of Bengal and Eastern India, Crafts Council of West Bengal, Calcutta, India, 1982.

২৮. Unesco : 1995.

বাংলাদেশের দারুশিল্প

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের পরিসীমায় সাধারণ মানুষ একটি নৃগোষ্ঠী, জনজাতি হিসেবে জীবনধারা গড়ে। এই জীবনধারা থেকেই সংস্কৃতি রূপলাভ করে। জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির পরিচয় ও স্বাতন্ত্রকে সনাক্ত করে। মানুষের জীবনধারা লোকজীবনধারা-সংস্কৃতির অনুষঙ্গ, লোক ও কারুশিল্প লোকজীবনধারার অপরিহার্য অঙ্গ। লোক ও কারুশিল্প সংস্কৃতির বস্তুজাত রূপ হিসেবে লোকজীবনধারার বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে। এ কারণেই লোকজীবনধারার সংগে সম্পৃক্ত লোক ও কারুশিল্প কেবল শিল্পকলাই নয় বরং তা সাংস্কৃতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক। অর্থাৎ লোক ও কারুশিল্প নৃগোষ্ঠী সম্পর্কীয়, জনজাতির শিল্পকলা বিষয়ক।[১]

সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাপনে গড়ে ওঠা লোকজীবনধারায় সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের লোক ও কারুশিল্প একটি অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহের মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়কে তুলে ধরা ও সনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে। লোক ও কারুশিল্প কোন অঞ্চল, অঞ্চলের প্রাকৃতিকপরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, মানুষের লোকজীবনধারার সংগে সংশ্লিষ্ট বলে এর তৈরি, সৃষ্টিতে কাঁচামালের চয়ন, নির্ধারণ নির্ভর করে অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশে কাঁচামালের উৎপাদন, প্রাপ্তি ও সহজলভ্যতার উপর। লোকজীবনে সাধারণমানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনে তৈরি লোক ও কারুশিল্প উপযোগিতার ও সৌন্দর্যের বস্তু, জিনিস। আঞ্চলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য ও গুণ লোকশিল্প, বস্তুর গড়নসৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। লোকজীবনধারায় চলে আসা ধর্মীয় ও লোকজবিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রাত্যহিকতা, গার্হস্থ্য জীবনসহ জীবনধারণের নানাদিক বিধৃত হয় লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টিতে। মানুষ তার অনুভব ও চেতনাকে গোষ্ঠীর চেতনায় লোকজীবনধারার উল্লিখিত উপাদানগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় গড়ণ, অলংকরণ ও রংএর লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি করে। পরিণত হয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জনজাতির জীবনধারা, — লোকজীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির লোক ও কারুশিল্প।

লোক ও কারুশিল্প বস্তু, জিনিস বা গড়নসম্পর্কীয়। লোক ও কারুশিল্প তৈরিতে প্রাকৃতিকউপাদান, কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। লোক ও কারুশিল্পের ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতার নিরিখে যেমন এর শ্রেণীকরণ করা যায়, তেমনি এর তৈরিতে প্রাকৃতিক

উপাদান বা কাঁচামালের ব্যবহারের নিরিখে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যায়।

বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিমন্ডল রয়েছে। এই ভৌগলিক পরিমন্ডল রূপলাভ করেছে মৌসুমী বায়ু, বৃষ্টি, বর্ষা, নদনদী, খালবিল, ক্ষেতখামার, গাছপালা, বৃক্ষরাজি, পশুপাখি সমন্বয়ে সৃষ্ট পরিবেশে। আবহমানকাল থেকে এদেশের মানুষ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে লোকজীবনধারা-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলে। এভাবেই দেশের সংস্কৃতি রূপলাভ করেছে। এর উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। ইতিহাসপূর্ব অতীত আছে। ঐতিহাসিক সময়ের ধারার উন্মেষ রয়েছে। এর ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিকতা রয়েছে। এ ধারাবাহিকতা আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে বসবাসরত মানবগোষ্ঠী, জনজাতির কর্ম, চিন্তা, চেতনায় উজ্জ্বল হয়েছে। এভাবেই ক্রমাগত সমন্বয়, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এখানকার সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ এদেশে বসবাসরত মানবগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্টি হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে কাদামাটি, বাঁশ, বেত, গাছ, ঘাস, তন্তু সহজলভ্য উপাদান, কাঁচামাল। বাংলাদেশের মানুষ লোকজীবনধারায় প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রয়োজনে এসব প্রাকৃতিক উপাদান, কাঁচামালকে ব্যবহার করে, প্রয়োগ করে। এদেশের মানুষ পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৌশল, দক্ষতা, অলংকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপকরণ ও কাঁচামালকে পরিণত করে লোক ও কারুশিল্পে। এতে সাধারণ মানুষের লোকজীবনধারা-সংস্কৃতির সকল অনুষঙ্গই অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়। ফলে লোক ও কারুশিল্পে বাংলাদেশের মানুষের, জনজাতির লোকজীবনের প্রয়োজন, উপযোগিতা, ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সৌন্দর্যবোধ বিধৃত।

সাধারণমানুষ আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের লোকজীবনধারার অপরিহার্য অঙ্গ লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি ও ব্যবহার করে এদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিমন্ডলে প্রাকৃতিকপরিবেশে বহু বিচিত্র ধরনের বৃক্ষ অনায়াসে জন্মায়। ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে কাঠ সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ এবং বাংলাদেশের লোকজীবনে সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের জীবনযাপনে যেসকল লোক ও কারুশিল্প তৈরি করে তার মধ্যে কাঠের তৈরি লোক ও কারুশিল্প-দারুশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি সহজলভ্য আম, কাঁঠাল, শিমুল, ছাতিম, নিম, কড়ই, জাম, শাল, চাপালিশ, গামারি, তাল, সেগুন, মেহগনি, বাবলা, তুলা, কদম ও ছাতিম গাছের কাঠ দিয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রামের সাধারণ মানুষ উপযোগিতামূলক, ধর্মীয়, লোকজ বিশ্বাস, শিশুতোষ ও শিক্ষামূলক, গৃহনির্মাণে এবং গার্হস্থসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত নানা ধরনের দারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলাদেশের লোকজীবনধারায় লালিত দারুশিল্পের সঙ্গে লোকসমাজ সম্পৃক্ত। দারুশিল্পের শিল্পী সূত্রধর সম্প্রদায় এবং ব্যবহারকারী লোকসমাজের মানুষ। প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশের লোকসমাজের মানুষকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে। যেমন (ক) গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষ ও (খ) আদিবাসী, ক্ষুদ্র জনজাতি অর্থাৎ উপজাতিসমূহ। পরবর্তীতে গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষ কালিক ব্যবধানে আরো দুইভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- (১) গ্রামীণ লোকসমাজের মানুষ (২) আধুনিক শহর ও নগর সমাজের মানুষ।

মূলতঃ বাংলাদেশের আদিবাসী, ক্ষুদ্র জনজাতি বা উপজাতিসমূহের মানুষ এবং কৃষিজীবী গ্রামীণ লোকসমাজের অন্তর্ভূক্তসূত্রধর সম্প্রদায়-দারুশিল্পের শিল্পী। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জনজাতিসমূহের পরিচয়ের মানুষরা তাদের নিজ নিজ জীবনধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দারুশিল্প তৈরি করে। যেমন উপজাতি, আদিবাসীদের নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। বাংলাদেশের লোকসমাজে দারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগণ সূত্রধর সম্প্রদায়ের বলে পরিচিত। মূলতঃ সূত্রধর পেশাভিত্তিক সাধারণ মানুষের এই পরিচয়টি এদেশের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ লোকসমাজের অবদান।[২] সূত্রধর সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে কৌশল উত্তরাধিকার সূত্রে রপ্ত করেছিল তা কেবল দারুশিল্পের কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সূত্রধর সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই পোড়ামাটির বা পাথর উভয় ক্ষেত্রে স্থপতি বা ভাস্করের কাজও করত।[৩] অর্থাৎ সূত্রধরদের স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকার সকলকেই বোঝাতো।[৪] আজো প্রাচীন লোকসমাজের বহুপেশাজীবী মানুষ সমন্বয়ে গঠিত সমাজকাঠামোর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে ক্ষীণভাবে রূপান্তরিত ধারায় হলেও অব্যাহত রেখেছে এখনকার গ্রামের ছুতার বা সুতার মিস্ত্রীগণ।

বাংলাদেশের আদ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ার দরুন এখানে কাঠের কারুশিল্প অর্থাৎ দারুশিল্পের প্রাচীন নিদর্শনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আনুমানিক দশম শতাব্দী বা তার কিছু পরবর্তী সময়ের দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দুটি স্তম্ভ ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলের টঙ্গীবাড়ী থানার সোনারং গ্রামের একটি পুকুর থেকে সংগৃহীত। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংগৃহীত ও প্রদর্শনের জন্য গ্যালারীতে রাখা আছে। প্রায় একই সময়ের দারুশিল্পের আর একটি নিদর্শন কাঠের তীর্থংকর মূর্তি ফরিদপুর থেকে পাওয়া গেছে। বর্তমানে ভারতের কোলকাতায় আশুতোষ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে অর্থাৎ গীতিকাব্যে বাংলার দারুশিল্পের বর্ণনা মেলে। যেমন কমললোচনের চন্ডীকাব্যে "সেহিত ভূবন মাঝে স্ফুটিকের স্তম্ভ সাজে, দ্বারেতে কপাট মনোহর।"[৫] ময়মনসিংহ গীতিকায় বারদুয়ারী প্রাসাদের বর্ণনা আছে। যেমন ময়মনসিংহ গীতিকায় বর্ণনা আছে "খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া মশারী"[৬] অথবা "বহুব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিড়ি"[৭] এ ছাড়াও "উত্তম কাঠালের পিড়িগুলি ঘরেতে পাতিল"[৮] এবং "সুন্দর পিড়িগুলি মান্দারের সার"[৯] বা "চাপা নাগেশ্বর পাটি কাঠের চৌদল, নানা চিত্রাবলী তাতে আকিছে

সকল"[১০] কবিকঙ্কন চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দোলার বর্ণনা আছে। মঙ্গল কাব্যে ডিঙ্গা ও নৌকার বহুবিচিত্র নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন ময়ুরপংখী, টিয়াঠুটি, সিংহমুখী, মকরমুখী, চন্দ্রধারা, শুক্লাপাখী, শংখচুড়, হংসখল প্রভৃতি[১১]। চন্ডী কাব্যে উল্লেখ আছে যে ডিঙ্গা তৈরিতে "কাঠাল, পিয়াল, শাল, তাল, গাম্ভারী, তমাল বহু নখে চিরে দিল বহু, দারুব্রহ্ম, গাঢ়য়ে গজাল" যে সকল যন্ত্রপাতি সূত্রধররা ব্যবহার করত যেমন "শিল সানায়ে কসি, পাটি চাঁচে রাশি, নানা ফুল বিচিত্র কলস"[১২] এখানে উল্লেখ্য যে চন্ডীকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং চন্ডীমন্ডল বা মঙ্গল কাব্যে বাংলার লোকজীবন ধারায় প্রচলিত সাধারণ লোক ও কারুশিল্পের বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

বাংলাদেশের লোকজীবনধারা লোকসংস্কৃতির সংগে সম্পৃক্ত লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত দারুশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন মৃৎশিল্প বা পাথরেরমূর্তির মত কালজয়ী না হলেও গত একশ বছরের পুরানো দারুশিল্পের নিদর্শনের রূপ কালিক ব্যবধানে সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারায় ক্রমপুঞ্জিত রূপে এখনো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জনপদ গ্রাম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জনজাতির জনপদের জীবনধারায় অব্যাহত, প্রবহমান। তার উপর ভিত্তি করে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশের দারুশিল্প লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত এবং লোক ও কারুশিল্প নৃগোষ্ঠীর, জনজাতি বিষয়ক। এই প্রেক্ষিতে লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন জাতিতত্ত্বের নিরিখে হওয়াই শ্রেয়। বাংলাদেশের দারুশিল্পের পর্যালোচনায় এর জাতিতাত্ত্বিক দিক তুলে ধরতে হলে লোক ও কারুশিল্পকে জাতিতত্ত্বের পরিসীমায় পর্যালোচনার প্রয়োজন।

অর্থাৎ লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য এ প্রসঙ্গে নির্ধারণ করা প্রয়োজন (ক) জাতিতত্ত্বের পরিসীমা। (খ) জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে কালিক ব্যবধানে যে সকল জনজাতির জীবনধারার সমন্বয়ে সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারায় আজকের বাংলাদেশের যে সাংস্কৃতিক মানচিত্র রূপলাভ করেছে তা পর্যালোচনা করা। (গ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে সাধারণমানুষ-বাংলাদেশের মানুষকে সনাক্ত করা। লোক ও কারুশিল্প জনজাতি বিষয়ক। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত দারুশিল্পকে জনজাতি বিষয়ক কারুশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আরো বিস্তারিত বলতে গেলে এতদিন শিল্প সমালোচক ও শিল্পকলা ইতিহাসবিদগণ লোক ও কারুশিল্পকে সৌন্দর্যের ও শিল্পকলার ইতিহাসের বিচারে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছে। অথচ এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়, অসম্পূর্ণ। জনজাতির জীবনধারা-লোকজীবনধারা-সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে লোক ও কারুশিল্পকে মানুষের জীবনযাপনের সকল দিক প্রতিনিধিত্ব করে, এই বিবেচনায় এনে লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অপরিহার্য। অর্থাৎ লোক ও কারুশিল্পকে জাতিতত্ত্বের বিচারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের দারুশিল্পকে জনজাতি বিষয়ক কারুশিল্প হিসেবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশের লোকজীবন এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও সীমারেখায় কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। লোকজীবনধারার এই প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশের লোকসংস্কৃতি, বস্তুজাত সংস্কৃতির গড়ন ও রূপ নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষিজীবীভিত্তিক লোকজীবনধারার অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত দারুশিল্প। লোকজীবনধারায় সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, লোক ও কারুশিল্প হিসেবে প্রবহমান, সচল। এর শ্রেণীকরণ নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে ঃ

১. কৃষি কাজের সরঞ্জাম ঃ লাঙ্গল, ঢেকি, কাহাইল।

২. গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস ঃ কাঠের চামচ, কাঠের বাসন, বাটি, কাঠের বাক্স, কাঠের জলচৌকি, কাঠের প্রদীপ দান।

৩. বাসস্থানের জন্যঃ ঘরে অলংকৃত খুটি, কড়িবর্গা, অলংকৃত দরজা, অলংকৃত বেড়া, চৌকাঠ।

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনে ঃ নৌকা. গরুরগাড়ীর চাকা, পাল্কী।

৫. মানুষের সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্তঃ কাঠের কারুকার্যময় একতারা, দোতারা।

৬. শিশুদের আনন্দ বিধানসংক্রান্তঃ কাঠের চিত্রিতমমিপুতুল, চাকাওয়ালা চিত্রিতঘোড়া, হাতী, কাঠের খেলনা।

৭. ধর্মীয়, লোকজ বিশ্বাস সংক্রান্তঃ কোরাণ পড়ার রেহাল, কাঠের মূর্তি, বৃষকাষ্ঠ, পূজার মন্ডপ, পূজার আসন, নামাজের আসন।

৮. সাধারণ আসবাবঃ জলচৌকি, কাঠের বাক্স, কাঠের তাক, খাট, পালঙ্ক।

৯. সাজসজ্জাঃ চন্দনকাঠের মালা।

১০. ক্ষুদ্র জনজাতি বা উপজাতি সমূহের দারুশিল্পঃ যেমন চাকমা, মারমা, তঞ্চইঙ্গা, ত্রিপুরী, সাওতাল, গারোদের কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র।

১১. আধুনিক নগর ও শহর জীবনের রুচির দারুশিল্পঃ আসবাব, খাট, সোফা, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি।

১২. আধুনিক নগর ও শহর জীবনে নাগরিক রুচির ঘর সাজানোর অলংকৃত দারুশিল্পঃ কাঠের হাতী ঘোড়া, পাখি, ফুলদানী।

উপরোক্ত শ্রেণীর দারুশিল্পের সৃষ্টিতে শিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উওরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কলা কৌশল, অলংকরণ পদ্ধতি, নকশা ও গড়ন তৈরিতে ঐতিহ্যিক ধারাকে ব্যবহার করে। এসব উপাদানকে কেন্দ্র করে দারুশিল্প সৃষ্টি, রুপ বা গড়ন লাভ করলেও প্রতিটি অঞ্চলের লোকজীবনধারার পরিচয়, শিল্পীর পৃথক ব্যক্তিসত্ত্বা, শিল্পীসত্ত্বা প্রয়োগের ফলে স্থানভেদে, কালভেদে, শিল্পীভেদে দারুশিল্প প্রধান একটি বা

একের অধিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় হয়। যেমন নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁয়ের সূত্রধর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি দারুশিল্প চিত্রিত হাতী ও ঘোড়া "সোনারগাঁয়ের" এবং "সোনারগাঁয়ের নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের " এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে।

যেহেতু লোক ও কারুশিল্প জনজাতি বা জাতিতত্ত্ব বিষয়ক সেহেতু দারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহের লোকসমাজের মানুষের জীবনধারার পরিচয়, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পী ও কারিগরের ব্যক্তি মানসিকতা, লোকসমাজে শিল্পীর অবস্থান এবং অনুভব ও চেতনাকে আবিস্কারে সক্ষম হওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে লোক ও কারুশিল্প-দারুশিল্পের ঐতিহ্য থেমে যায়নি, স্তব্ধ হয়নি। রুপান্তরিত ধারায় প্রবহমান রয়েছে।

মূলতঃ লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশের ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের দারুশিল্পের বিস্তার সাধারণ প্রয়োজন থেকে সৌন্দর্যের । কালিক ও বাংলাদেশের আঞ্চলিক ব্যবধানে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ ও পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় আজ অবধি বাংলাদেশের দারুশিল্পের ধারা লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মতই প্রবহমান, রুপান্তর, প্রক্রিয়ায় অব্যাহত রয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১. Yulian Bromley and Alla Ter-Sarkisyants, "Main Directions of Soviet Ethnographic Research" Social Sciences Vol-3, 1983 USSR Academy of Sciences.

২. Charles Malony, "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali culture", Tribal culture in Bangladesh, Ed Dr. Mahmud Shah Qureshi, IBS, Rajshahi University, 1984.

৩. তারাপদ সাঁতরা,বাংলার মন্দির ঃ মন্দির গড়ন স্থপতিদের ঠিকানা, চতুষ্কোণ, ফাল্গুন ১৩৭৬, কোলকাতা।

৪. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) কলিকাতা ।

৫. দিজ কমল লোচন, চন্ডীকাব্য, সাহিত্য পরিচয়, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৯ কলিকাতা।

৬. ময়মনসিংহ গীতিকা , ১ম খন্ড, কাজলরেখা, পৃঃ ৩২২।

৭. কবিকংকণ চন্ডীকাব্য, পৃঃ ১২০।

৮. ময়মনসিংহ গীতিকা, কাজল রেখা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৫।

৯. মনসামঙ্গল, বেসাতি, বংশীদাশ, দারিক চক্রবর্তী সং।

১০. মনসামঙ্গল, বেসাতি, বংশীদাস।

১১. কবিকংকন চন্ডীকাব্য, বঙ্গবাসীসং পৃঃ ২২৩।

১২. কবিকংকন, চন্ডীকাব্য, বঙ্গবাসী সং পৃঃ ২২১-২২।

Tamonash Chandra Dashgupta, Aspects of Bengali Society from old Bengali literature, Calcutta, 1935, Page 299-302.

সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের খেলনা ও পুতুল

বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো লোককারুশিল্প। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের লোকসমাজেই আবহমানকাল থেকে এদেশে গড়ে উঠেছে চমৎকার বৈশিষ্ট্যময় গ্রামীণ লোক ও কারুশিল্প। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এই ঐতিহ্যময় লোক ও কারুশিল্প। বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি এই লোক ও কারুশিল্প। আরো বিস্তৃত অথচ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, "আবহমান বাংলার লোকসমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে যে চারু ও কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা-ই লোকশিল্প"।[১] আবহমান বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয় মিলবে এই লোক ও কারুশিল্পের রূপে, বিষয়বস্তুতে এবং বৈশিষ্ট্যে।

কেবল শিল্প সৃষ্টিই লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, এর সংগে লোকশিল্পের শিল্পী, কারিগরের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীবনাচার, ও লোকজবিশ্বাসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে লোক ও কারুশিল্পের প্রতিটি নিদর্শনে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, সমাজ, অর্থনীতি, প্রযুক্তির ছাপ পড়েছে নানা ভাবে-বৈশিষ্ট্যের, স্বাতন্ত্রের দাবিদার হয়েছে। এ ছাড়াও লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আমরা খুঁজে পাব বাংলার প্রকৃতি সহজলভ্য উপাদান-কাঁচামাল, সামাজিকগঠন, আঞ্চলিকবৈশিষ্ট্য, সময়ের, কালের ব্যবধানগত তারতম্যের বৈশিষ্ট্য, পৌরানিক ও লৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, কিংবদন্তী, নানা নকশা, বৈচিত্রময় গড়ন, বর্ণ, প্রযুক্তি এবং বংশানুক্রমিক দক্ষতার নিপুন পরিচয়।

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিমন্ডলের পরিসীমায় এদেশের গ্রামের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ রূপ লাভ করেছে। মৌসুমীবায়ু বৃষ্টি, বর্ষা ও নদনদীর দেশ বাংলাদেশ। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁদা মাটি, বাঁশ, বেত, কাঠ, ঘাস সহজলভ্য উপাদান। এসব উপাদানই বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের উদ্ভব ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, বৈশিষ্ট্য নিরুপণে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশের সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ সমূহের মধ্যে কাঠ অন্যতম। কাঠ বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের কাঁচামাল বা উপকরণ হয়েছে অনিবার্যভাবে। অতিসহজলভ্য আম, কাঠাল, শিমুল ছাতিম, নিমগাছ

দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ উপযোগিতামূলক, ধর্মীয়, শিশুতোষ, শিক্ষামূলক কাজে, গৃহনির্মাণসহ নানাধরনের লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। কাঠের তৈরি লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টিতে যেসব শিল্পী, কারিগর সংশ্লিষ্ট তারা বাংলাদেশের প্রাচীনকাল থেকে কাঠ ও চিত্রমাধ্যমে যুগপৎ কাজ করতে অভ্যস্ত। এরা সূত্রধর বলেও পরিচিত। এছাড়া পাথর ও মাটি এই দুই মাধ্যমেও সূত্রধরগণ কাজ করতে পারত। বাংলাদেশে কাঠের কাজের-লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য ও ধারা অতিদীর্ঘকালের। যদিও বাংলাদেশে কাঠ ছাড়াও পাথরেরউপাদানে মূর্তি নির্মাণ করেছে এই সূত্রধর সম্প্রদায় মৌর্যপূর্ব যুগ থেকে। তথাপি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেশে কাঠ সহজলভ্য, পাথর নয়। কাঠ এদেশের মাটি ও মানুষের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। এ কারণে বলা যায়, বাংলাদেশের কাঠের ভাস্কর্য পাথরের ভাস্কর্যের তুলনায় অধিকতর প্রাচীন। এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য কাঠের ভাস্কর্যের কাজের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলো রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে দশম ও একাদশ শতাব্দীপূর্ব কাঠের ভাস্কর্য ও অলংকরণ কাজের কোন নিদর্শন সংরক্ষিত নেই।

এ প্রসঙ্গে ১৩৩৯ বৈশাখে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলার রসকলা সম্পদ প্রবন্ধে গুরুসদয় দত্ত উল্লেখ করেছেন, "বাংলাদেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণবশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীরভাগ পাথরের পরিবর্তে কাঠের ও মাটির উপরে তাহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাহাদের ভাস্কর্য কলাকৌশলের বিন্দুমাত্রও গৌরবহানি বর্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, কাঠ-ভাস্কর্যে সুনিপুন ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাহার শিল্পকৌশল ষোলআনা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে অশোক যুগে সাচি ও ভারহুতের ভাস্কর্যশিল্পীগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাহাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।.....পরিকল্পনার নিখুত নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবির অভিব্যাঞ্জনায়, কারুকার্যের সুনিপুন ছন্দে এবং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মানবদেহের অংগপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লালিত্যের রুপসৃষ্টিতে এই দারুসৃষ্টিগুলি জগতের ভাস্কর্যশিল্পে যে অতি উচ্চস্থান অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিস্প্রয়োজনীয় গুটিকয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রঁদ্যা প্রভৃতি বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের নিপুনতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ প্রতিভামূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয়সম্পদ। কিন্তু বর্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল অতিশীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে"[২] এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সূত্রধর সম্প্রদায় কাঠের মত সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপাদানকে

কাজের, সৃষ্টির, ভাস্কর্যের মাধ্যম হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। ফলশ্রুতিতে সূত্রধর সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্মে বাস্তুবিদ্যা থেকে ভাস্কর্য, ভাস্কর্য থেকে কাঠের পুতুল ও খেলনা এবং সর্বপরি দৈনন্দিন, গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগিতামূলক আনুষঙ্গিক কাঠের জিনিসপত্র রয়েছে। বিচিত্র মাত্রার, রুপের, গড়নের পরীক্ষামূলক ও বংশপরম্পরায়ের দক্ষতার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক -সৃষ্টিমূলক কাজের পরিচয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে, গৃহে, মন্দিরে, ব্যক্তিগতসংগ্রহে, যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন নিদর্শনসমূহে এবং লোকশিল্পের প্রবহমান ধারায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রসংগে কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় তার "মধ্যযুগে বাংলা" গ্রন্থে লিখেছেন "১১৭২ সালের নির্মিত পাকা চন্ডীমন্ডপের বারান্দার বাড়ির প্রান্তে খোদিত যে হাতী শুড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি এ কালে কোন বাঙালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখিনা। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বের এক মাটির চন্ডী মন্ডপের চারিটি কাঠালের খুটি ৫০ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, তাহার উপরে খোদিত অদ্ভূত কারুকার্য আর এদেশে দেখা যায় না"[৩] মূলতঃ কাঠের তক্ষণ, ভাস্কর্য, কাঠেরকাজের প্রাচীনধারার প্রবহমান ধারা এখনো সূত্রধরদের মধ্যে সক্রিয়, এই সূত্রধরগণই যেকোন ঘর-কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক বানাতে গিয়ে দরজা, চৌকাঠ, খুটি, কড়িরকাজে কাঠখোদাই করে তাদের সৃষ্টি, দক্ষতা ও কারিগরিজ্ঞানের পরিচয় দিতেন। এসব কাজ করতে গিয়ে ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। অর্থাৎ সূত্রধরগণ কাঠের মাধ্যমে লোক ভাস্করের কাজ করেছেন। এই শিল্পীগণ কাঠের আসবাব, খাট, পালংক, চৌকি, তৈজশপত্র, কাঠেরপুতুল ও খেলনা তৈরি করেছেন অর্থাৎ আজও প্রাচীন সূত্রধরগণের আজকের প্রজন্ম কাঠমিস্ত্রী বর্তমান আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়েও ক্ষীণ ধারায় হলেও উল্লিখিত কাঠের কাজ করে চলেছে।

সুত্রধরগণের সৃষ্টির ক্ষীণ অথচ সচলধারার প্রবাহ এখনো খুঁজে পাব কাঠের নানাকাজে, এরমধ্যে কাঠের চিত্রিতপুতুল ও খেলনা অন্যতম। এখনো এইধারার উপস্থিতি ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামে বিদ্যমান। উল্লিখিত পুতুল ও খেলনার মধ্যে রয়েছে চাকাওয়ালা হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং কাঠের মমি পুতুল ইত্যাদি। এসব পুতুল ও খেলনা আমড়া, জিয়ল, শ্যাওড়া, ছাতিম ও শিমুল প্রভৃতি কাঠ থেকে তৈরি হয়। এগুলো নরম কাঠ, কারুশিল্পী, সূত্রধরগণ এসব কাঠে ভাস্কর্য-জাত ত্রিমাত্রিক, চতুমাত্রিক পুতুল ও খেলনা তৈরিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। সূত্রধরগণ চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে অতিসহজে সংগ্রহকরা এসব কাঠে তাদের পূর্বপুরুষের কারিগরি জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে গ্রামীণ লোকসমাজের সাধারণ মানুষের জন্য সৃষ্টি করে চলেছে চিত্রিত খেলনা ও পুতুল। অঞ্চলভেদে, সূত্রধরদের পরিবারভেদে, ব্যক্তিকারুশিল্পীভেদে, কালভেদে এসব পুতুল ও খেলনার গড়নে, রুপে, কৌশলে, অলংকরণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ও সনাক্তকরার মত। অভিন্ন সাধারণ একটি ধাচ, চরিত্র হয়ত রয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত পর্যায় পর্যালোচনা, মূল্যায়ন সর্বপরি বিশ্লেষণমূলক জরিপ

করা হলে কাঠের খেলনা ও পুতুলের বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলো, এর পরিবর্তন, রুপান্তরের ধারাগুলো বহুমাত্রিক গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকরা সম্ভব হবে।

সময়ের সংগে পাল্লাদিয়ে এই কাঠেরপুতুল ও খেলনা রুপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রবহমান ধারায় পুরুজ্জীবিত হচ্ছে, সচল রয়েছে, ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কাঠেরখেলনা ও পুতুল সূত্রধরগণ তৈরি করেন। এসব পুতুল ও খেলনার মধ্যে কাঠের হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং মমি পুতুল উল্লেখযোগ্য। বছরের নানাসময়ে যেমন চৈত্রসংক্রান্তি, পৌষমেলা, বারনি, দূর্গাপূজার সময়ের মেলা, ঈদের, মহররমের মেলা, এমনকি এখনকার আধুনিক নগরে ও শহরে আয়োজিত বিশেষমেলায় এসব কাঠেরপুতুল ও খেলনা বিক্রি হয়।

উল্লিখিত চিত্রিত কাঠেরপুতুল ও খেলনার ব্যবহারে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে একটি সাধারণ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ব্যবহার শিশুদের আনন্দ দেয়া ও ঘরের অন্যান্য আসবাবের সংগে শোভা বৃদ্ধি।

এ প্রসংগে ঢাকার এখনকার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঠের চাকাওয়ালা এককাঠের কালো রং এর চিত্রিত হাতী, হলুদ রং এর চিত্রিত ঘোড়া ও বাঘ এবং বিচিত্র রংএর মমিপুতুল বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সোনারগাঁয়ের এসব কাঠেরখেলনা ও পুতুলের সমাদর ও জনপ্রিয়তা সারা বাংলাদেশে। লোকজীবনের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের ধারার মতই প্রবহমান ও চলমান। এমনকি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও এর প্রসার লাভ করেছিল। সোনারগাঁয়ের প্রাচীন লোকমেলা লাঙলবন্দ ও কুমিল্লার গঙ্গাসাগর মেলার মাধ্যমেই এসব কাঠের পুতুল ও খেলনা দেশের ও ভারতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে সোনারগাঁয়ের কাঠের খেলনা ও পুতুল ঢাকামহানগরীর আধুনিক কারুশিল্পের দোকান, বিপনীকেন্দ্রে বিক্রির জন্য বাজারজাত হচ্ছে। বিদেশে নিয়মিত রপ্তানী হচ্ছে। এখন দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান যাদুঘরেও সোনারগাঁয়ের কাঠেরহাতী, ঘোড়া এবং পুতুল সংগৃহীত, সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাঠের চিত্রিতখেলনা ও পুতুল তৈরিতে সোনারগাঁয়ে এখন মোট তিনটি সুত্রধর পরিবার তাদের পূর্বপুরুষের পেশাকে অনুসরণ করে কাজ করছে। এদের মধ্যে মৃত নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে মাত্র একজন পূর্বপুরুষের পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের চাচাত ভাই মনীন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর এবং তার ভাই গোপালচন্দ্র সূত্রধর সোনারগাঁয়ে এখনো কাঠের চিত্রিতপুতুল ও খেলনা তৈরির কাজ করছেন। এই তিন পরিবারের মধ্যে নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর জাতীয়পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং শিল্পী কামরুল হাসান নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের শিল্পকর্ম বিখ্যাত এককাঠের চাকাওয়ালা হাতী ও

ঘোড়াকে পুরুজ্জীবনের প্রয়াস নেন এবং এই দুই মহান শিল্পী নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরকে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, মর্যাদা দেন। নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের তৈরি প্রসিদ্ধ হাতী ও ঘোড়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার শিল্পকর্ম বিশেষ করে হাতী ও ঘোড়া দেশের ও বিদেশের বহু যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সোনারগাঁয়ের অন্য দুটি পরিবারের সূত্রধরগণের তৈরি ঐ অভিন্নরূপের, গড়ণের হাতী ও ঘোড়ার সংঙ্গে নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের তৈরি হাতী ও ঘোড়ার বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য অতিসহজেই চোখে পরে, সনাক্ত করা যায়। যদিও সোনারগাঁয়ের হাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরির কৌশল ও দক্ষতার ধারা প্রায় এক ও অভিন্ন, বংশপরম্পরায় থেকে চলে আসা লোককারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত, তথাপি এখানকার প্রতিটি শিল্পকর্মে শিল্পীর, কারিগরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ এতে পড়ে অনিবার্যভাবে। লোকশিল্পের বিশ্লেষণের পদ্ধতির ধারায় এই বৈশিষ্ট্যকে মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে। আর এজন্য লোকশিল্প লোকমনের, লোকজীবনের হলেও শিল্পীর নিজ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময় লোকশিল্প-কাঠের চিত্রিতঘোড়া ও হাতীর বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। নরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরও চিরায়ত লোকজকৌশল ও দক্ষতাকে অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। তবে তিনি বাড়তি যোগ করেছিলেন তার শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য, ফলে লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সাধারণ হাতী ও ঘোড়া নরেন্দ্রের হাতী ও ঘোড়ায় পরিণত হয়েছিল। ঠিক একইভাবে বর্তমানে মনীন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর তার নিজ বৈশিষ্ট্যের চিত্রিত কাঠেরহাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরি করছেন। এ প্রসংগে কেবল Contextual গবেষণা ও দলিল করণে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সোনারগাঁয়ের এই বৈশিষ্ট্যময় হাতী ও ঘোড়া পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া শান্তিপুরেও বর্তমানে তৈরি হচ্ছে। এ প্রসংগে Indian Dolls and Toys গ্রন্থের লেখক অজিত মুখার্জির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "Santipur Nadia refugee toymakers have settled here and manufacture wooden horses, elephants, figure toys etc. Large sized -toys are also made"[৪] এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ের লোকজ বৈশিষ্টের কাঠের হাতী, ঘোড়া ও পুতুল তৈরির ধারা কেবল কালভেদেই অব্যাহত নয় অঞ্চল ও দেশ ভেদেও অব্যাহত। উল্লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত চাকাওয়ালা চিত্রিত কাঠের হাতীর ছবিই তার প্রমাণ।

সোনারগাঁয়ের কাঠের চিত্রিতহাতী, ঘোড়া, বাঘ ও মমিপুতুলের আকার, গড়ন লোকজীবনে ও লোকমনে প্রতিষ্ঠিত। সুত্রধর, শিল্পীগণের বংশানুক্রমিক কৌশল, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এইসব উপাদান পরিপূর্ণ সুষমামন্ডিত ছন্দময়, বর্ণাঢ্য চিরায়ত কালজয়ী খেলনা ও পুতুলের আকার ও গড়ণ সৃষ্টির অনিবার্য পরিমাপ আবিষ্কার সম্ভব করেছে। যেমন ঘোড়া ও হাতী তৈরিতে দৈর্ঘ ৪ প্রস্থ ২ এবং উচ্চতা ৬ এই সাধারণ আনুপাতিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এই অনুপাতেই হাতী ও ঘোড়ার আকার বড় ও ছোট করা হয়। প্রথমে উপরে

উল্লিখিত আনুপাতিক মাপে করাত দিয়ে কাঠ কেটে আয়তাকার কাঠখন্ডে পরিণত করা হয়। এর পরে হাতুরি, বাসলি, উকা ও বাটালী এই সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে সোনারগাঁওয়ের সূত্রধরগণ দ্রুতগতিতে, আপনমনে, অনায়াসে পুতুল ও খেলনা তৈরি করেন। লোহার হাতুরি দিয়ে বা কাঠের মুগুর দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে আঘাতের মাত্রা বাড়িয়ে ও কমিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভাস্কর্য সৃষ্টির সকল পুথিগত আধুনিক ব্যাকরণ ও পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে নানা গড়নের পুতুল ও খেলনা গড়ে, তৈরি করে। কাটা ও মোটাদাগের খোদাই এর প্রাথমিক কাজটি হয়ে যাওয়ার পর কৌশলের বিচিত্র শৈল্পিকমাত্রা যোগ করে অর্থাৎ হাতের সাধারণ ছোয়ার মধ্যদিয়ে একটি পরিপূর্ণ ভাস্কর্যগুণের খেলনা ও পুতুলে পরিণত হয়। খেলনা হাতী, ঘোড়া ও বাঘ চতুর্মাত্রিক এবং মমি পুতুল ত্রিমাত্রিক। প্রতিটি খেলনার নীচের অংশে পুরুপাটাতন সৃষ্টি করা হয়। ঘোড়া, হাতী ও বাঘকে যাতে টেনে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এই লক্ষ্যে শিল্পী এতে চারটি কাঠের চাকা সংযোজন করেন। এতে খেলনা চলমান খেলনায় পরিণত হয়। মমি পুতুল এরকম নয়। মমি পুতুল ৪ ইঞ্জি থেকে ৯ ইঞ্জি দৈর্ঘ্য, সাধারণতঃ এই মাপেরই করা হয়।

এরপরে রং লাগানোর কাজ। মূলশিল্পী খোদাইএর কাজ করেন। এরা সাধারণতঃ রং লাগান না। তবে রং লাগানোর বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ মূল কারুশিল্পীর সহযোগী কারুশিল্পীরা এই কাজটি করে। প্রধান কারুশিল্পীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য স্ত্রী, বোন, মেয়ে, ছোটভাই এবং পরিবারের অন্য সদস্য রং দেয়ার কাজটি করে থাকে। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং মমিপুতুলের রং দেয়ার যে প্রচলিতরীতি চলে আসছিল তা এখন অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হচ্ছে না। ফলে সময়ের ও কালের ব্যবধানে এক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে অনিবার্যভাবে। যেমন রং দেয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক। প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী এমনকি ৩০ বছর আগেও যেভাবে রংদেয়ার কাজটি অনুসরণ করা হত এখন তা পুরোপুরি অনুসৃত হচ্ছে না। আগে তেতুলের বিচিরগুড়া সিদ্ধ করে আঠা বা লেই তৈরি করে সেই লেইএর সংগে লাল, নীল, হলুদ, কালো ও মেটেরং মিশিয়ে খেলনা ও পুতুলে রং দেয়ার উপযোগীকরে প্রয়োজনমত ঘন করে হাতে তৈরি রং বানানো হতো। সহজ লভ্য হরিতকি, গিরিমাটি, হিংগল, নীল এবং ভূসাকালি থেকে উল্লিখিত রং কারুশিল্পীরা নিজেরাই ঘরে তৈরি করতেন। এছাড়া সাদা রং তৈরি করা হত সাবুদানা, বার্লি গুড়া করে পানিতে গুলিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে লেই বা আঠা বানিয়ে তাতে চকখড়ি মিশিয়ে। পুরানোধারার প্রচলিত এই রং বানানোর পদ্ধতি সোনারগাঁয়ের সূত্রধরসম্প্রদায়ের কারুশিল্পীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সবারই জানা ছিল। এক অলিখিত ভেষজ জ্ঞানের পদ্ধতি, তাদের জীবনের চারপাশের পরিবেশ তাদেরকে অনিবার্যভাবে শিখিয়েছে। এই জ্ঞান নিশ্চয় যুগযুগ ধরে ব্যবহারিক জ্ঞানের, অভিজ্ঞতায় এবং দক্ষতার পরিসীমায় একটি গ্রহণযোগ্য লোকজধারায় পরিগণিত হয়েছিল বলেই অলিখিত অথচ প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতি। কালের পরিবর্তনে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়। লোক ও কারুশিল্প এ থেকে

পরিত্রাণ পাবে কি করে? ফলে সোনারগাঁয়ের সূত্রধরদের বংশপরম্পরায় চলেআশা কাঠেরপুতুল ও খেলনার রং এখন প্রাচীন পদ্ধতির ঘরে তৈরি রংএর বদলে বাজারের আধুনিক সিনথেটিক রং শিল্পীরা তাদের খেলনা ও পুতুলে ব্যবহার করছে। সোনারগাঁয়ের সূত্রধর শিল্পীরা যদিও কাঠের চিত্রিতপুতুল ও খেলনায় রং লাগানোর পদ্ধতি পুরানো নিয়মে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সময়ের ও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুন এতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটছে। প্রথমে শিল্পী তার তৈরি কাঠেরপুতুল ও খেলনার আদল, গড়ন সৃষ্টি করে। এর পরে রোদে শুকানো হয় তিন থেকে চার দিন ধরে। তারপর সেগুলোকে শিরিশকাগজ দিয়ে ভালো ভাবে ঘষা হয়। ঘষার পর কাঠেরপুতুল ও খেলনার আদল, গড়নের বিভিন্ন অংশ ফুটে উঠে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ফুটে উঠে। পরিপূর্ণ ভাস্কর্যের গুণ লাভ করে। উপরিতল মসৃণ হয়। এরপর সূত্রধর, শিল্পীগণ পুরানো লোকজধারায় খেলনা ও পুতুলের অঙ্গে সাবুদানা গুড়া অথবা বার্লির আঠার সংগে চকখড়ি মেশানো রংএর প্রাথমিক আস্তরণ দেয়। সাদা রং লাগিয়ে পুনরায় একদিন শুকাতে হয়। এর পর শিল্পী কালো, হলুদ, লাল, সবুজ এবং নীল ইত্যাদি রং লাগাতে কাপড় দিয়ে কোনা করে ও ছাগলের লেজের চুল দিয়ে হাতে বানানো যথাক্রমে মোটা ও চিকন তুলি ব্যবহার করে। এসব তুলি দিয়ে পুরানো নিয়মে তেতুলের বিচিরআঠা এবং সাবুদানার আঠার সংগে প্রাকৃতিক ভেষজ রং বা বাজারের গুড়া রং মিশিয়ে রং করার কাজ করা হত। এখন হাতেতৈরি পুরানো নিয়মের রং এর বদলে সিনথেটিক রং দিয়ে খেলনা ও পুতুলে রং করা হয। এছাড়া এখন পুরানো ধারার পরিবর্তন করে আধুনিক ব্রাসও শিল্পীরা ব্যবহার করছে। সোনারগাঁয়ের চাকাওয়ালা হাতী কালো রংএর, ঘোড়া হলুদ রংএর, বাঘ হলুদ এবং মমি পুতুল যেমন রাজা রাণী, মন্ত্রী, পাইক ইত্যাদি শিল্পীর সুবিধা মত রং লাল, গোলাপী হলুদ ইত্যাদি রংএর হয়। উল্লিখিত পুতুলগুলোর একটা সাধারণ রং দেয়া হয়ে গেলে চিকন ব্রাস দিয়ে নানা রংএর চিকন লাইন এঁকে অঙ্গসজ্জা করা হয়। হাতীর পিঠে মাহুতের বসার স্থানসহ অলংকৃত রাজকীয় আসন, ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়ারীর অলংকৃত আসন, হাতীর ও ঘোড়ার চোখ, কান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অঙ্গসজ্জা এবং মমিপুতুলগুলোর পোষাকপরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদি শিল্পীর তুলির নানা রংএর এর সৃষ্টিশীল দ্রুত অথচ সাবলীল দক্ষ আচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়াও ঘোড়াকে কল্পনারঘোড়া বানাতে তুলির আচড় দিয়ে শিল্পী ঘাড়ের দুপাশে উড়ন্ত পাখা একে "পংখীরাজ ঘোড়া"য় পরিণত করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম সৃষ্টি মৃৎশিল্পী ও মাটিরপুতুলের চিত্রায়ন পদ্ধতির সংগে সোনারগাঁয়ের কাঠের খেলনা ও পুতুলের চিত্রায়নে মিল খুজে পাওয়া যায়। এ প্রসংগে মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন তাঁর Living Crafts in Bangladesh গ্রন্থে সোনারগাঁয়ের চিত্রিতকাঠের পুতুল সম্পর্কে বলেন "Wooden doll in Lakshmi Shara style"[৫] মূলত প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটির পুতুলের গ্রামীণ শিল্পী চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে কাঁচামাটি অবস্থায় চাপ দিয়ে এবং দাগ কেটে যে ভাবে চোখ, কান, ঠোট, নাক, অলংকার, চুল ও অঙ্গসজ্জা সৃষ্টির

মধ্যদিয়ে রেখার সৃষ্টি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রং দিয়ে চিত্রের মত এ কাজটি করতে শিল্পীর চিকন তুলির রঙ্গীন আচড়ে অনুরূপ রেখা অনিবার্যভাবে আবির্ভূত হয়েছে কাঠের পুতুলে ও খেলনায়। প্রায় এক ও অভিন্ন গুণাগুণ, ছাপ effect সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রসংগে প্রাচীন পোড়ামাটির চার চাকার ঘোড়া পুতুলের কথাও এসে যায়। কারণ ধারণা করা হচ্ছে, সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ও কাঠের চাকাওয়ালা ঘোড়া ও হাতী সৃষ্টির পরিকল্পনায় সূত্রধরগণের দৃষ্টিতে প্রাচীন চাকাওয়ালা পোড়ামাটির পুতুল একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করেছে। সব মিলিয়ে সোনারগাঁয়ের হাতী, ঘোড়া, বাঘ ও মমিপুতুল খেলনা ও পুতুলের চিত্রায়নে ইম্প্রেশনধর্মী চিত্রকলার রূপ ও পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিল্পী, সূত্রধরগণ নিজেরা বিষয়বস্তুকে যে ভাবে কল্পনায় অনুভবে ও চেতনায় দেখেছেন ঠিক সেইভাবেই তাদের পুতুলে ও খেলনায় চিত্র অংকনের চেষ্টা করেন। বাস্তবে যে রূপ ও রং রয়েছে তা থেকে আরো কোন কল্পনার রং।

লোকশিল্পের ঐতিহ্য বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজ টিকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের লোকসমাজ এদেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল শেকড়। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূলশেকড় সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় কালজয়ী লোকশিল্পের ধারা নানা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে সময়ের ও কালের ব্যবধানে রুপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে টিকে রয়েছে।

সোনারগাঁয়ের সূত্রধরগণের সৃষ্টি চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতী এবং পুতুল এদেশের কালজয়ী লোকশিল্পের সেরা নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এই কালজয়ী চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতী এবং পুতুলের শিল্পীদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। এদের উজ্জীবিত করা হলে উল্লিখিত খেলনা ও পুতুল চিরায়তধারায় পুণরুজ্জীবিত হবে আগামী দিনের জন্য। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোককারুশিল্পের পুরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সোনারগাঁয়ের ঐতিহ্যমন্ডিত লোকশিল্প চিত্রিত কাঠের হাতী, ঘোড়া ও পুতুলের এখনকার সর্বজৌষ্ঠ বর্ষিয়ান কারুশিল্পী ৮০ বছর বয়স্ক মনিন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের সৃষ্টি কর্ম, কৌশল, পদ্ধতি, দক্ষতা সনাক্ত ও দলিলিকরণ করা প্রয়োজন। এবং সোনারগাঁয়ের এই খেলনা ও পুতুলের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হলে আজকের প্রজন্ম সোনারগাঁয়ের কালজয়ী চিত্রিত হাতী, ঘোড়া ও পুতুলের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে। বাংলাদেশের সকল লুপ্তপ্রায় চিরায়ত লোকশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দিয়ে ঐতিহ্যের চিরায়ত লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। সম্ভব হবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবহেলিত লোককারুশিল্পের দক্ষ বর্ষিয়ান কারুশিল্পীদের উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করা। তা কেবল সম্ভব হবে "কারুশিল্পগ্রাম কর্মসূচীর' মাধ্যমে।

বোধকরি সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের চাকাওয়ালা হাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং পুতুল লোকশিল্পের চিরায়ত সুষমা ও শৈল্পিক নমনীয়তার গুণে সমৃদ্ধ, যা পোড়ামাটির পুতুল ও চিত্রিত মাটির পুতুলে লক্ষ্যণীয়। সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠেরহাতী, ঘোড়া, বাঘ এবং পুতুলে কারুশিল্পী শৈল্পিক নমনীয়তাকে তার বংশ পরম্পায়ের কৌশল ও দক্ষতার চমৎকারী গুণে ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীলভাবে, সাচ্ছন্দে।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ মাহবুব আলম, লোকশিল্পের সংজ্ঞা, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনার গাঁও ১৯৯১।

২. গুরুসদয় দত্ত, বাংলার রসকলা সম্পদ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৯।

৩. কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাংলা, ১১৭২।

৪. Ajit Mukerjee, Indian Dolls and Toys.

৫. Muhammad Sirajuddin, living Crafts in Bangladesh.

মানিকগঞ্জের বাঁশের কারুশিল্পের একজন কারুশিল্পী

প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক উপাদান এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আবহাওয়া ও জলবায়ু একটি বৈশিষ্ট্যময় সাধারণ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এবং প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে এতদাঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনধারা, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ফলে দক্ষিণএশিয়ার দেশগুলোর প্রকৃতিতে, আবহাওয়ায়, জলবায়ুতে যেমন একটি সাধারণ মিল, অভিন্নতা লক্ষণীয়, তেমনি জীবনধারা-সাংস্কৃতিক জীবনধারায় অনুরূপ সাধারণ মিল সনাক্ত করতে কষ্ট হয় না। ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য–উপাদান এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যকে নির্মাণ করেছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে তার বসবাসের, জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। অর্থাৎ মানুষকে সর্বত্র তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানকে ব্যবহার, কাজে লাগিয়ে একটি অপ্রধান, গৌণ পরিবেশ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়[১] এবং মুখ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় মানুষ একটি গৌণ পরিবেশ–সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এভাবেই জীবন ধারায়-সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাকৃতিক উপকরণ ও কাঁচামাল সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করে।[২] দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক জীবনধারা সনাক্ত করা যায় নানা বস্তু ও জিনিসে। সাংস্কৃতিক জীবনধারা-আহার বাসস্থান, পরিচ্ছদের প্রয়োজনে প্রকৃতির উপকরণ, কাচামাল বস্তুতে এবং জিনিসে পরিণত হয় যেমন, বাঁশ, বেত, মাটি, তুলা, কাঠ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণ, কাঁচামাল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব প্রাকৃতিক উপকরণ, কাঁচামাল এতদাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনধারায় সাংস্কৃতিক জীবনের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

প্রাকৃতিক উপাদান বাঁশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং বাঁশের কারুশিল্প

বাঁশ কেবল দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে জন্মে। ঘাসজাতীয় বাঁশগাছ এতদাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাছ।

জীবনধারায় সংস্কৃতিতে বাঁশ মিশে আছে। প্রায় এক হাজার প্রজাতির বাঁশগাছ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের লোকজীবনধারায় লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।[৩] মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ও সাধারণ মানুষের জীবনধারা-লোকসাংস্কৃতিক জীবনের সংগে বাঁশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লোকজীবনে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঁশের ব্যবহার এতদাঞ্চলের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতিকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়। বাসস্থান, কৃষি, গার্হস্থ্যজীবন অর্থাৎ লোকজীবনধারা -লোকসংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে আজঅবধি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতদাঞ্চলের মানুষ বাঁশ দিয়ে সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে বস্তুজাত সংস্কৃতির নানা বস্তু, জিনিস, লোক ও কারুশিল্প। বাঁশ সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনধারায়, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যে সকল অভিন্ন বৈশিষ্ট্য, মিল দেখা যায় তার মধ্যে বাঁশের ব্যবহারকে চিহ্নিত করা যায়। এই অঞ্চলের দেশগুলোর জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, জিনিস এবং লোক ও কারুশিল্পে যে মিল ও অভিন্নতা দেখা যায় তার প্রমাণ উল্লিখিত অঞ্চলের বাঁশের ব্যবহারে তা মেলে। এর ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের লোকজীবনে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি বস্তু, লোকশিল্প, কারুশিল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মিল তা গড়নে, রং এবং ব্যবহারের ধরনে লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং বাঁশের কারুশিল্প

দক্ষিণপুর্বএশিয়ার দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও বাঁশ জন্মে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি করে বাঁশ ঝাড় থাকার রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে চলে আসছে। আজো বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে ভিটি বাড়িতে বাঁশঝাড়ের প্রাচীন ঐতিহ্য যে অব্যহত রয়েছে তা বর্তমান গ্রামের পুরানো ভিটি বাড়িগুলিই তার প্রমাণ। বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনধারায় প্রতিদিনের প্রয়োজনে বাঁশের বহুমাত্রিক ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কাঁচামাল, উপকরণ হিসেবে বাঁশ দিয়ে গ্রামের মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে, জীবনধারার প্রয়োজনে নানা জিনিস, বস্তু গড়ে, সৃষ্টি করে। এভাবেই এদেশের সহজলভ্য বাঁশ দিয়ে বাংলাদেশের লোকজীবনধারার বৈশিষ্ট্যের জিনিস, বস্তু-কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। এবং বাঁশ বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতি, লোক ও কারুশিল্পের উপাদান হয়েছে। বাঁশের তৈরি লোক ও কারুশিল্প ধারণ করে আছে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগিতা, অর্থনৈতিক দিক এবং সৌন্দর্যগুণ। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বাঁশের তৈরি নানা জিনিস-বস্তু লোক ও কারুশিল্প সাধারণ উপযোগিতা থেকে সৌন্দর্যগুণে রূপান্তরিত হয়। কারণ

মানুষের মানসিক অস্থিরচিত্ত অবস্থা, কৌতুহল এবং বৈচিত্র্যের স্বাদ বস্তু, জিনিস, কারুশিল্প তৈরিতে আরোপ করে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়িয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত অনুভব মানুষকে তাড়িত করে। এ প্রসংগে বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনের গড়ন ও সম্পূর্ণতার বাহ্যরূপ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ লুই বলেছেন যে, বস্তু, কারুশিল্প সরাসরি উপযোগিতার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। অর্থাৎ বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে উপযোগিতার গুণ, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আছে অসাধারণ বাড়তিমাত্রার প্রতিসমগুণ, সুরুচিসম্পন্ন, সুন্দর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলের পরত[৪] বাংলাদেশের বাঁশের কারুশিল্প তেমনি প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্যের। বাঁশের তৈরি লোক ও কারুশিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গ্রামের মানুষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জনজাতি- উপজাতিদের জীবনাচারণ, কায়িক পরিশ্রম, কর্মকান্ড, অনুভব, চেতনা ও অভিপ্রায় ধারণ করে আছে। এভাবেই বাঁশের তৈরি বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু লোক ও কারুশিল্প এদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা[৫] হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

বাঁশ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। বাঁশ কাঁচামাল, উপকরণ হিসেবে লোক ও কারুশিল্প তৈরির প্রয়োজনে কেন, কিভাবে একটি মৌলিক গঠন থেকে অন্য গঠনে, গড়নে, রূপে রূপান্তরিত হয় এবং বাঁশ প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু এবং লোক ও কারুশিল্পে রূপান্তরিত হয়ে কিভাবে লোকজীবনধারায় ব্যক্তি ও লোকসমাজের লোকজীবনধারায় প্রয়োজন মেটায়, এসব প্রশ্ন বাঁশের কারুশিল্পের সৃষ্টির অভিপ্রায় ও অভীষ্ট লক্ষ্য অনুপুংখ পর্যালোচনায় তা সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

যেহেতু বাঁশের তৈরি লোক ও কারুশিল্প বাংলাদেশের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, সেহেতু এর স্বরূপ বিশ্লেষণ জাতিতাত্ত্বিক পরিসীমায় নিহিত। এবং লোক জীবনধারার সংগে সম্পৃক্ত লোককারুশিল্প কেবল শিল্পকলা বিষয়ক নয় বরং তা সাংস্কৃতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক অর্থাৎ লোক ও কারুশিল্প-নৃগোষ্ঠী সম্পর্কীয়, জনজাতির শিল্পকলা বিষয়ক।[৬] এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বাঁশের তৈরি লোক ও কারুশিল্পও সাংস্কৃতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক।

বাংলাদেশের কারুশিল্পে বাঁশের ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকজীবনধারায় সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, লোক ও কারুশিল্প হিসেবে বাঁশের কারুশিল্পের ধারা প্রবহমান, সচল, এর শ্রেণীকরণ নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে।

ক)	কৃষি কাজ ও কৃষি জীবনের সংগে সম্পৃক্ত। ঃ	বাঁশের তৈরি কৃষকের মাথাল, ওরা, ভার ইত্যাদি। মাছ ধরার চাই, খালই, মাছ রাখার পাত্র, মাছ ধরার জুইতা
খ)	গৃহ নির্মাণঃ	বাঁশের দোচালা, চারচালা, আটচালা ঘর। বাঁশের বেড়া, ঝাপ, বেলকি, দরমা।
গ)	গার্হস্থ্য কাজে ঃ	বাঁশের ঝুড়ি, (নানা গড়নের) দুধ মাপার জন্য বাঁশের চোংগা।
ঘ)	যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা ঃ	বর্শা, ঢাল, লাঠি, তীর, ধনুক, বল্লম।
ঙ)	যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ঃ	নৌকা, গরুর গাড়ীর ছাদ বা ছই।
চ)	মানুষের সৌন্দর্য বোধ সংক্রান্ত ঃ	অলংকৃত ও নকশী ঝাপ, বেলকি, দরমা, বাঁশী।
ছ)	শিশুদের আনন্দ বিধান সংক্রান্তঃ	বাঁশের খেলনা।
জ)	ধর্মীয় লোকজ বিশ্বাস ঃ	বাঁশের তৈরি পুতুল।
ঝ)	সাজসজ্জা ঃ	বাঁশের ফুল, লতা (বাঁশের বেড়ায় ব্যবহৃত)
ঞ)	সাধারণ আসবাবপত্র ঃ	বসার আসন, চাটাই।
ট)	ক্ষুদ্র জনজাতি বা উপজাতি সমূহের ঃ	প্রতিদিনের জীবনধারায় ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের বাঁশের কারুশিল্প।
ঠ)	আধুনিক নগর ও শহর জীবনের নাগরিক রুচির বাঁশের কারুশিল্পঃ	আসবাবপত্র, ছাইদানী, ফুলদানী, পেনসিল বাক্স, অলংকার বাক্স, ছবির অলংকৃত ফ্রেম, ছড়ি, লাঠি।

বাঁশের কারুশিল্পের গবেষণা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ধারা

বাংলাদেশের বাঁশের লোক ও কারুশিল্প এদেশের জনজাতির, জাতিতত্ত্ব বিষয়ক-লোকসাংস্কৃতিক। স্বভাবতই জনজাতি, জাতিতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ও লোককারুশিল্পের সংগে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাঁশের লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।[৭]

১. বাঁশের লোক ও কারুশিল্পের পুংখানুপুংখ বর্ণনাসহ নিয়মাবদ্ধ বিশ্লেষণ ও গবেষণা। এই গবেষণা পদ্ধতির সংগে সম্পৃক্ত রয়েছে লোক ও কারুশিল্প তৈরির উপকরণ, কাঁচামাল বাঁশ, কলাকৌশল, সরঞ্জাম, বাঁশের কারুশিল্প তৈরির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বাঁশের কারুশিল্পের গড়ণ বৈশিষ্ট্য। বাঁশের কারুশিল্পে উপস্থাপিত বিষয় এবং উপরোক্তশৈল্পিক উপাদানের কাঠামোসমূহের মধ্যেকার আন্ত সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য।

২. বাঁশের লোক ও কারুশিল্পের শৈল্পিক দিক বিবেচনায় ব্যক্তি শিল্পীর শৈল্পিক ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক নানা দিক, সমাজে ব্যক্তি শিল্পীর অবস্থান এবং লোক কারুশিল্প সৃষ্টিতে এর প্রভাব।

৩. যেহেতু লোক ও কারুশিল্পের সংগে আর্থ-সামাজিক সংগঠণ এবং সমাজের বিবেচনা, বোধ বুদ্ধির সংগে সম্পৃক্ত, সেহেতু লোক ও কারুশিল্পের সংগে উল্লিখিত বিষয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা।

৪. বাঁশের লোক ও কারুশিল্প স্থান ও কালের ব্যবধানে বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের বলে বিবেচিত হয়। রূপান্তরিত হয়। সময় ও স্থান ভেদে বাঁশের লোক ও শিল্পের সৌন্দর্যে, রূপে শিল্পীর দক্ষতা, শৈল্পিক রীতি এবং ব্যবহারে কিভাবে রূপান্তর ঘটে তার গবেষণা। অর্থাৎ কারুশিল্পের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বন্ধীয়। লোকশিল্পের ইতিহাস এবং লোকশিল্প রীতির কালিক ইতিহাস বিষয়ক।

বাংলাদেশের লোকশিল্প হিসেবে বাঁশের কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণায় যে চারটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে বক্ষমান প্রবন্ধে মানিকগঞ্জের আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প দ্বিতীয় ধারার পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীর জীবন সংক্রান্ত, লোক ও কারুশিল্পের বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনপ্রণালী বিষয়ক গবেষণার সংগে শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ এই ধারার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন বস্তু, জিনিসের বৈশিষ্ট্য, গুণ, অবশ্যই অন্যের অনুভূতিতে নাড়া দেয় যে, বস্তু, জিনিস-লোককারুশিল্পটির শিল্পী নারী কিংবা পুরুষ, বৃদ্ধ কিংবা যুবক। মানসিক প্রকৃতি, মেজাজ অনুযায়ী শিল্পী অনুভূতিপ্রবণ কিংবা বিশ্লেষণধর্মী। অভিজাত মনোভাবের কিংবা সাধারণ পর্যায়ের মনোভাবের। একজন সাহসী ব্যক্তি কিংবা একজন ধর্ম পরায়ণ। শিল্পীর ব্যক্তিক পরিবর্তনশীল চল (Personal variables) লোক ও কারুশিল্পের তৈরির সংগে গভীর ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত।

মূলতঃ বাঁশের কারুশিল্প বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ-জনজাতি সমূহের লোকসমাজের লোকজীবনধারার এবং লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হলেও এর সৃষ্টির সংগে ব্যক্তিশিল্পী ও কারিগর এবং তার শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিকপর্যায় যুক্ত। শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা, মনস্তাত্ত্বিক দিক, লোকসমাজে শিল্পীর অবস্থান ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গ শিল্পীর সৃষ্টি লোক ও কারুশিল্পে প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব লোক ও কারুশিল্পের গড়নে, ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে, অলংকরণে, কলাকৌশলে প্রত্যক্ষভাবে বিধৃত। এই গবেষণার ধারায় একজন শিল্পী বা কারিগর সমগ্রজীবনের নানা পর্যায়ে তার লোক কারুশিল্পের সৃষ্টিকে কৌশলে, দক্ষতায়, অলংকরণে, কাঁচামালের ব্যবহারে, গড়ণে, বক্তব্যে যে রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন তার কার্যকারণ সনাক্ত করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বাঁশের কারুশিল্প প্রসঙ্গে মানিকগঞ্জের বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদ

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের সাধারণ মানুষ লোকজীবনধারায় বাঁশের ব্যবহার করে চলেছে। বাঁশের ব্যবহারের বিস্তৃতি সাধারণ প্রয়োজন থেকে সৌন্দর্য্যের। জনজাতি বিষয়ক কারুশিল্প- লোকশিল্প হিসেবে বাঁশের কারুশিল্প আমাদের দেশের গ্রামের লোকজীবনে এখনো সচল। ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার গুণে, বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়, এর ধারা প্রবহমান। যদিও মৌসুমী বায়ু, বৃষ্টি, বর্ষায় বাঁশের কারুশিল্পের কোন প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, নষ্ট হয়ে গেছে তথাপি লোকজীবন ধারায় এখনো বাঁশের কারুশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যে সক্রিয় রয়েছে তার প্রমাণ বাঁশের কারুশিল্পের ধারার প্রবহমানতা। প্রাচীন বাংলার জনপদে বাঁশের কারুশিল্প যে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের ছিল তার প্রমাণ দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ দেবী মূর্তির ভাস্কর্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-দেবী মূর্তি সিতাতপত্রা, কালো পাথরের ৪৫.৫ ইঞ্চি উচ্চতা, দশম শতাব্দীর এই মূর্তিটি দিনাজপুর থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহ নং-১১১৫।[৮] এখন এই ভাস্কর্যটি জাতীয় যাদুঘরের গ্যালারীতে প্রদর্শনের জন্য রাখা। বৌদ্ধ দেবী সিতাতপত্রা একটি বাঁশের-বেতের মোড়ায় আসন নিয়েছেন। সাধারণতঃ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে পৌরানিক রীতিতে ভাস্কর আসন হিসেবে পদ্মকেই বেছে নেন। এক্ষেত্রে এর ব্যক্তিক্রম ঘটেছে, পদ্মের বদলে বাঁশের-বেতের মোড়া ভাস্কর পাথর খোদাই করে ফুটিয়ে তুলেছেন। আনুমানিক দশম শতাব্দীর এই দেবী মূর্তিটির আসন বাঁশের মোড়ায় এদেশের বাঁশের কেচি, বা কেচকি বেড়ার কৌশল অনুসৃত হয়েছে যা আজো গ্রাম বাংলায় দেখা যায়, এমনকি অবিকল অনুরূপ মোড়া এখনো এদেশে তৈরি হয়। মোড়ার উপর, নীচে ও মাঝে বেতের সূদৃঢ় বন্ধুনটিও পাথরে খোদাইয়ের মাধ্যমে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন। সমকালীন লোকজীবন ধারায় প্রচলিত লোকশিল্পের ধারায় যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাঁশের কারুশিল্প এবং এই লোকশিল্পের কৌশল হাজার বছর ধরে অবিকৃত আছে, এখনো সচল। আমাদের লোকজীবন ধারা ও লোকশিল্পী এবং বাঁশের কারুশিল্পের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এই নিদর্শনটি একটি নিশ্চিত প্রমাণ। এছাড়া কবি জসিম উদ্দিন, ডঃ দিনেশ চন্দ্র সেন বাংলার বাঁশের কারুশিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। নিদর্শন হিসেবে ফাউন্ডেশনের যাদুঘরে প্রায় ৭০ বৎসরের পুরানো ময়মনসিংহের একটি দরমা ও একটি মসজিদের বেলকি প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে।[৯,১০] অঞ্চল ভেদে বাঁশের কারুশিল্পের ধারায়, কৌশল অনুসরণে একটা সাধারণ মিল লক্ষণীয়। সেটা বাঁশের সলা বা বাত্তি নির্মাণে, বস্তু, জিনিস, নির্মাণে ও বেড়া নির্মাণে। মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ থানার গিলন্ডগ্রামে বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদের বাড়ী। বাঁশের কারুশিল্পের কাঁচামাল, উপকরণ বাঁশ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মানিকগঞ্জ জেলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মানিকগঞ্জের বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদের গ্রাম গিলন্ডের বহু বাড়ীতে বাঁশের ঝাড় রয়েছে। এ গ্রামের বয়স্ক লোকদের সংগে কথা বলে জেনেছি যে

এখন এ গ্রামে আগের মত বাঁশ ঝাড় আর নেই। ৫০ বৎসর পূর্বেও এই গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে বড় বড় বাঁশ ঝাড় ছিল। এক সময়ে যে এই গ্রামে প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হতো তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় রাস্তার দুধারে সারি সারি পুরানো ঘন বাঁশ বাগানের দৃশ্যে। এই বাঁশ বাগানের বেশ নিকটেই আব্দুল হামিদের ভিটি বাড়ি। তিনি নিজেই ধানি জমিতে ভিটি করে ৩০ বছর আগে বাড়িটি করেছেন। পৈত্রিক বাড়ি নিকটেই। তিনটি ঘর নিয়ে তার ভিটিবাড়ি। বড়বেড়া ও টিনের ঘরের বিপরীতে একটি সনের ও বাঁশের বেড়ার বাংলাঘর এবং এই দুই ঘরের এক পাশে সনের ও বাঁশের পাকের ঘর, মাঝখানে উঠান, ভিটি বাড়ির চারপাশেই গাছপালা রয়েছে। এবং একটি বাঁশ ঝাড়ও আছে।

আবদুল হামিদের বয়স ৫৭, স্ত্রী, দুইপুত্র এক কন্যা নিয়ে তার সংসার। বড় পুত্র একটি কারখানার শ্রমিক, ছোটপুত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। জনাব হামিদের পিতা মরহুম আনুমোল্লা মসজিদে ইমামতি করতেন। সেই সংগে চাষবাস, ঘর গেরোস্থালি করতেন। হামিদ লেখা পড়া করেছেন একদিকে প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, অপরদিকে মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রথম জীবনে পেশা হিসেবে কৃষি কাজ ও অন্যের বাড়িতে ঘরের কাজে, বাঁশের বেড়া বানানোর কাজে কামলা হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সংগে গত ২৬ বছর ধরে মসজিদে ইমামতি করছেন। ভাল, মজবুত, নিখুত বাঁশের বেড়া তৈরি ও ঘর বানানোর কাজে এই গ্রামে আব্দুল হামিদের সুখ্যাতি আছে। হামিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এসব নিখুত, বাঁশের কাজ তিনি কিভাবে শিখলেন, কেবল তিনিই কি এমন কাজ জানেন, না আরো কোন শিল্পী আছে? এসব প্রশ্নের জবাবে আব্দুল হামিদ জানালেন গিলন্ড গ্রামে তার সমবয়সী বা বয়সে বড় বা মুরুব্বীগণ প্রায় সকলেই বাঁশের কাজ জানেন। তবে এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন গ্রামের লোক আগের মত বাঁশের কাজ করছে না। লেখাপড়া, শহরে চাকরি, ব্যবসায় লোকজন জড়িয়ে পড়েছে। বাঁশের, সনের ঘর তৈরি কমে গেছে। এবং হামিদের দুই ছেলে বাঁশের কাজ জানলেও করে না। বড় ছেলে কাজ করছে কাপড়ের মিলে। জনাব হামিদের জীবনের সমসাময়িক সময়ের প্রায় সকল লোকই বাঁশের কাজ জানত। তারা বয়সে বড় বা মুরুব্বীদের কাছ থেকে এ কাজ শিখেছিল। যেমন আব্দুল হামিদ শিখেছেন তার থেকে বয়সে বড় চাচাত ভাই মরহুম আজমউল্লাহর কাছ থেকে, মানিকগঞ্জে দুধরনের বাঁশই বেশী পাওয়া যায়, একটি বইরা বাঁশ, আর অপরটি মাখলা বা তল্লা বাঁশ। আব্দুল হামিদ এই দুই ধরনের বাঁশ দিয়েই কাজ করেন। শিল্পী হামিদ জানালেন যে, তিনি পলো, মাছ ধরার চাই, খালই, মুড়ি চালনি, ধানের চালনি, খৈ চালনি, বাঁশের হাত পাখা, বাঁশের বেড়া, বাও ঝাপ, বেলকি, বানাতে পারেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি যখন মানুষের বাড়িতে ঘর, বেড়া বানাতে

কামলা দিতেন তখন শখ করে, নিজের ইচ্ছায় সে সব কাজে কখনো কখনো ফুল, লতাপাতাতৈরি করতেন কিন্তু কখনো তার এই উপলব্ধি ছিলনা যে তিনি কেবল সাধারণ কামলাই নন অর্থাৎ তিনি কেবল প্রয়োজনে বাঁশের কারুশিল্পই তৈরি করেন না বরং সৌন্দর্যেরও কিছু করতে পারেন। ১৯৮০ সালের দিকে শিল্পী একদিন নৌকায় নদী পার হচ্ছিলেন, পথে দেখলেন এক ব্যক্তি ঢাকার দোকান থেকে কিনে আনা মুলির বাঁশ ও বেতের তৈরি একটি বই শেলফ নিয়ে যাচ্ছেন। পথে শেলফটির একটি অংশের বেতের বন্ধন খুলে যায় এবং শেলফটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সময়ে জনাব হামিদ ঐ শেলফটি যেখানে খুলে গিয়েছিল তা তার জানা বাধার কৌশলে সুন্দর ও শক্ত করে বেধে দিলেন। এ সময়েই জনাব হামিদের উপলব্ধিতে এলো ঘরের কাজের বেড়া বাধা, বাত্তি, বেলকি করা ছাড়াও বাঁশ দিয়ে আরো অন্য ধরনের জিনিস, সৌন্দর্যের জিনিস তৈরি করা যায় এবং তিনি তা করেছেন, পারেন। এবং একই সময়ে শিল্পী চেষ্টা চালালেন তার কাজে নতুনত্ব ও বৈচিত্র আনা যায় কি করে। তিনি বাঁশের নিখুত বেড়াকে অবলম্বন করে এবং মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে বাঁশের বেড়ার একটি আলমারি তৈরি করলেন। এবং আলমারিটি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অফিসে দিলেন। এই আলমারিটি তার সৃষ্টি ও শিল্পসুষমাকে তুলে ধরার সচেতন প্রয়াস। আব্দুল হামিদের তৈরি এই অলংকৃত বাঁশের আলমারিটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল প্রখ্যাত লোকশিল্প গবেষক জনাব তোফায়েল আহমদের। জনাব তোফায়েল আহমদ হামিদের বাঁশের আলমারিটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন "পথে রিকসা থামিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে গিয়ে বাঁশের আলমারী দেখে মধুর বিস্ময়ে (Pleseant surprise) জাগলো এতো কল্পনার বাইরে, বাঁশের পাল্লায় আবদ্ধ আলমারীর গায়ে এবং অলংকরণে তৈল রং। একটু চকমকে, তবু সবকিছু ছাপিয়ে তার সৌন্দর্য আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য কে তার শিল্পী?"[১১]

"গায়ের মসজিদের ইমাম ৬৫ ডিসিমিল ভূমির মালিক আব্দুল হামিদ মক্তবে পড়ান, কামলা খাটেন, ঘরামির কাজ করেন। তার ঘরে ছিল আর একটি আলমারী", জনাব তোফায়েল আহমদ এই শিল্পীকে শিল্পীর কাজকে শিল্পকলা রসিক, বোদ্ধা গবেষকদের মধ্যে তুলে ধরলেন।

আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্পের ধারা শুরুতে ঘরের বেড়া বানাতে গিয়ে বেড়ার চার কোনায় নকশী অলংকৃত ফুল, লতাপাতা পাখি আপন মনেই তৈরি করতেন। নিজের ঘরের বা অন্যের ঘরের বেলকি, দরমা ও বাওঝাপ তৈরি করেছেন সুন্দর নকশী ও অলংকৃত বাঁশের লতাপাতা ও ফুল দিয়ে এবং এছাড়াও আবহমান বাংলার লোকজীবনধারার অলংকার ও ফুল লতাপাতা ছাড়া প্রতিদিনের গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনের বাঁশের পলো, চাই, চালনি, হাত পাখাও তিনি তৈরি করতে পারেন। নিজের

সাংসারিক প্রয়োজনে এসব জিনিস হাট থেকে না কিনে নিজেই তৈরি করে ব্যবহার করেন।

ব্যাক্তি শিল্পী জনাব আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্পে এদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা প্রয়োজন ও সৌন্দর্যগুণ যুগপৎ সক্রিয় তবে জনাব হামিদ তার বাঁশের কারুশিল্পে কৌশল ও দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন নকশী বাওঝাপ, বেলকি দরমা এবং বাঁশের আলমারী তৈরিতে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ ১৯৮৬ সালে আয়োজিত দেশের গুণী, দক্ষ কারুশিল্পীদের নিয়ে ঢাকায় কর্মরত কারুশিল্পী ওয়ার্কশপে জনাব আব্দুল হামিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ জনাব হামিদকে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী সম্মানে সম্মানিত ও পুরস্কার প্রদান করে। জনাব হামিদের তৈরি বেশ কিছু নকশী বাওঝাপ, বেলকি, দরমা, আলমারী ইত্যাদি বাঁশের কারুশিল্প ঢাকায় বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে কারুশিল্পের শৈল্পিক নিদর্শন হিসেবে স্থান পায়। যাদের সংগ্রহে জনাব হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প রয়েছে তাদের মধ্যে জনাব তোফায়েল আহমদ, মালেকা খান, জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের যাদুঘর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশেও অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পেয়েছে, নকশী বাওঝাপ প্রদর্শিত হয়েছে। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এ শিল্পীর তৈরি কারুশিল্প বাওঝাপ, দরমা, নকশী বেলকি প্রদর্শিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের লোকজ উৎসব '৯৭ এ কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে জনাব হামিদ অংশগ্রহণ করেন।

জনাব আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প এদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের। আবহমান বাংলার লোকজীবন ধারায় যেভাবে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টির পথ পেয়েছে, আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প একইভাবে সৃষ্টির পথ পেয়েছে। জনাব হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প প্রয়োজনের, বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত, এদেশের লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানও বটে। হামিদের বাঁশের কারুশিল্পের কাঁচামাল বাঁশ, বেত মানিকগঞ্জেই সহজলভ্য। মানিকগঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের পরিসীমায় এখানকার মানুষ আবহমান কাল ধরে যে গৌণ পরিবেশ-লোকজীবনধারা-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং এই প্রেক্ষিতে এখানে যে রূপের, বৈশিষ্টের, গঠনের বস্তু সংস্কৃতি, লোকশিল্প গড়ে উঠেছে তার ক্রমপুঞ্জিত প্রবহমান ধারার সংগে সম্পৃক্ত জনাব আব্দুল হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প। হামিদ তার চারপাশের প্রাকৃতিক উপাদান থেকে বাঁশকে চয়ন করে কেবল বাঁশের কারুশিল্প তৈরির কাজ, নির্মাণকে বেছে নেন। গ্রামীণ লোকজীবনধারার অপরিহার্য হামিদের তৈরি বাঁশের ঘরের বেড়া, ঝাপ, মাছ ধরার ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত অতি পরিচিত বাঁশের তৈরি

জিনিস, বস্তু,-কারুশিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। জনাব হামিদ উপরে উল্লিখিত বাঁশের কারুশিল্প তৈরি করলেও এর মধ্যে বিশেষ করে নকশী বাঁশের বেড়া অর্থাৎ বাওঝাপ, দরমা, বেলকি বানাতেই বেশী পছন্দ, করেন। তার কাজের ধারাতে তারই প্রমাণ মেলে। যেহেতু হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্পগুলো বাংলাদেশের লোকজীবন ধারার, জাতিতত্ত্ব, জনজাতি (Ethnographic) বিষয়ক বস্তুজাত সংস্কৃতির (Material Culture) অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু এর তৈরি, সৃষ্টির সংগে সম্পৃক্ত আছে।

ক. কাঁচামাল, বাঁশ
খ. আব্দুল হামিদের বাঁশের কারুশিল্পের সৃষ্টির অভিপ্রায়, লক্ষ্য
গ. কলাকৌশল
ঘ. সৃষ্টিতে বিষয়গত দিক (Content)
ঙ. সৃষ্টির গঠন প্রক্রিয় (Form)

ক. কাঁচামাল, বাঁশ

হামিদ মানিকগঞ্জের তার গ্রাম গিলন্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সৃষ্ট লোকজীবনধারায় লোকসাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছেন, জীবন যাপন করেছেন। গিলন্ড গ্রামের অন্য আর দশজনের মত হামিদও জীবন সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। এখানে আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের আর সকল অঞ্চলের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ কৃষিজীবন- লোক সমাজের আর্থ-সামাজিক লোকজীবনধারার পরিসীমায় হামিদ কাঁচা বাঁশের, সনের ঘর বানানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সংগে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বাঁশ এদেশের প্রকৃতির সহজলভ্য উপকরণ কাঁচামাল, এই কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা এদেশের বাস্তুশিল্পের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র নির্মাণ করেছে। রূপলাভ করেছে বাংলার বৈশিষ্ট্যের বাঁশের সনের দোচালা, চারচালা, আটচালা, ঘর, কুটির। বাঁশ বাস্তু শিল্পের প্রধান উপাদান বলে বাঁশের বেড়া নানা বৈশিষ্টের, বৈচিত্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্থান করে নিয়েছে। যেহেতু নদীমাতৃক এদেশ, সেহেতু এদেশের মানুষকে মাছ ধরতে হয়, প্রয়োজন হয় নানা ধরনের বাঁশের চাই, খালই, পাত্র যা একান্ত বাংলাদেশের তদুপরি গার্হস্থ আরো কত কাজে কত প্রয়োজনীয় বাঁশের তৈরি জিনিস যা এদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত এবং বাংলাদেশের লোকজীবনধারা লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রাম এর ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রাম হাজার বছরের বাংলার গ্রামের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। এই গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছেন জনাব হামিদ। গিলন্ড গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার চেনা। বাঁশের কারুশিল্পী তার চার পাশেই রয়েছে। শৈশব থেকে তিনি অবলোকন করেছেন প্রতিদিনের জীবন যাপনে, প্রয়োজনে, জীবিকায় কিভাবে

পাশের মানুষ পুরুষানুক্রমে বাঁশের কাজ করে যাচ্ছে। এ দেখা বাঙ্গালী সংস্কৃতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখা। কিভাবে কেবল একটি সরঞ্জাম লোহার তৈরি দা দিয়ে বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ সংগ্রহ করতে হয়, কোন বাঁশটি কাটার উপযোগী, কি কাজে কি ধরনের বাঁশের প্রয়োজন, সব তিনি প্রতিদিনের জীবনে তার জনপদ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৌশল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছেন জীবনে চলার পথে কাজ করতে গিয়ে, লোকজীবনে। বাঁশের কারুশিল্প যা আমাদের বস্তুজাত সংস্কৃতির অংশ তা আমাদের জীবনাচারণে, লোকজজীবনে, কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাও আব্দুল হামিদের জানা। যেমন গিলন্ড গ্রামের প্রতি ঘরেই বাঁশের ঘর আছে, তাতে বেড়া, বেলকি, ঘরের ভেতরের বাওঝাপ, মাছ ধরার বাঁশের সরঞ্জাম যেমন চাই, পলো, খালই, যুইতা, ঘরে ব্যবহারের জন্য বাঁশের তৈরি পাখা ইত্যাদি আছে। বাঁশের কারুশিল্পের শিল্পী হামিদ এসব জিনিসকে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে নিজের জীবনধারার বলে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু কারুশিল্প প্রতিদিনের লোকজীবনধারায় প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্যের। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরিতে প্রকৃতির উপকরণ কাঁচামাল বাঁশ সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে গিলন্ড গ্রামে হামিদের কারুশিল্পের কর্মপ্রবাহকে নির্ধারিত, সনাক্ত করেছে। শিল্পীর জীবনকে প্রবহমান রেখেছে। এবং তার কাজ প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে।

খ. আব্দুল হামিদের বাঁশের কারুশিল্পের সৃষ্টির অভিপ্রায়, লক্ষ্য

লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক উপাদান। আবহমান বাংলার লোকজীবনধারার বহুমাত্রিক প্রয়োজনে, অনুষঙ্গে লোককারুশিল্পের সৃষ্টি। এর ব্যবহারে যেমন বৈচিত্র রয়েছে, তেমনি এর সংগে সম্পৃক্ত রয়েছে জীবনাচারণের নানা দিক। গিলন্ড গ্রামে যুগযুগ ধরে চলে আসা লোকজীবনধারার প্রয়োজনেই যেমন লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টি তেমনি হামিদের বাঁশের তৈরি কারুশিল্প লোকজীবনধারার প্রয়োজনের। হামিদের বাঁশের কারুশিল্পে শিল্পীর অনুভব, চেতনা, দৃষ্টি ভঙ্গী, কর্ম পরিবেশ, জীবনযাপনের পদ্ধতি-লোকসংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি তার জীবনধারার প্রয়োজনের সকল বাঁশের কারুশিল্পই তৈরি করতে পারেন। তবে অধিক স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন বাওঝাপ ও বেলকী তৈরিতে।তার তৈরি বাঁশের কারুশিল্প সৃষ্টি নিম্নলিখিত প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষি কাজে

জনাব হামিদ দৈনন্দিন কৃষি কাজের প্রয়োজনে কৃষি মালামাল পরিবহনে নানা ধরনের ঝাকা, ঝুরি মাছ ধরার চাই সরঞ্জাম তৈরি করেন। নিজের জীবন যাপনে প্রতি দিনের প্রয়োজনেই এসব জিনিস তিনি তৈরি করেন। বাজারে, হাটে তিনি এসব তৈরি করে বিক্রি করেন না।

বস্তু নির্মাণে

জনাব আব্দুল হামিদ বাঁশের কারুশিল্পী। জীবনযাপন করেছেন বাঁশের-সনের ঘরের কাজে কামলা হিসেবে কাজ করে। তিনি বাঁশের বেড়া তৈরি করতে পারেন। তিনি প্রয়োজনের ছাড়িয়ে সৌন্দর্যের অলংকৃত বেড়া বানাতে পারেন। এবং মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের সকল বাড়িতেই মূল ঘরের এক পাশে শুকনা খাবার, ফল, ধান, চাল ইত্যাদি মেঝের উপরে বাঁশের একটি পাটাতন করে পাটাতনের উপর রাখা হয়। এবং এই পাটাতনটি একটি বেড়া, বাওঝাপ দিয়ে বিভক্ত করা হয়। গিলন্ড গ্রামের লোকজীবনধারায় এটা রেওয়াজ। এই বাওঝাপ সাধারণত জালের মত, কেচকি বেড়া, খাড়া বাঁশের চিকন সলা দিয়ে ঝালরের মত করে তৈরি হয়, যাতে বাতাস চলাচলা করে,, এ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। বাওঝাপ আয়াতাকার, সাধারণত ৮ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রস্থ হয়ে থাকে। লম্বা দিকটি ৩ ফুট উঁচু পাটাতনের সংগে আটকিয়ে দেয়া হয়। প্রস্থের দিকটি খাড়া ভাবে খুটির সংগে বাধা হয়। একদিকে বাঁশের পাটাতনের উপর ওঠার জন্য সামান্য ৩ ফুট খোলা থকে। গিলন্ড গ্রামে এখনো আশি ভাগ বাড়িতে এই ঐতিহ্যবাহী বাওঝাপ রয়েছে। এটি এখানকার লোকজীবন ধারার, আমাদের লোকসংস্কৃতির উপাদান। সাধারণতঃ বাওঝাপ তৈরিতে কারুশিল্পী ঝালর, খোপ যাতে দৃষ্টি কটু না ঠেকে তার জন্য বাওঝাপে সাধারণত বেড়াকে কিছুটা সূক্ষ ও অলংকৃত করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ঘরের দরজা, জানালার উপরিভাগ থেকে ঘরের চারপাশের খুটির উচ্চতা পর্যন্ত বেলকিও জনাব হামিদ তৈরি করেন। বেলকিতেও ফুল লতা পাতা করা হয়। জনাব হামিদ ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় বাওঝাপ ও বেলকি তৈরি করেন। ফুল, লতা পাতা দিয়ে বাওঝাপ ও বেলকি অলংকৃত করেন।

সৌন্দর্যের

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বাঁশ ও সনের ঘরের অতি প্রয়োজনীয় বেলকি, দরমা, ঝাপ, মাঝট কারুশিল্পীরা তৈরি করে। এবং এগুলো অলংকৃত হয়। যেমন রংপুরের কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, মোহনগঞ্জ, ফুলপুর, অষ্টগ্রামে উল্লিখিত অলংকৃত নকশী বাঁশের কাজের নিদর্শন দেখা গেছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরে ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি নকশী দরমা ও একটি মসজিদের অলংকৃত পবিত্র কোরানের আয়াতসহ আরবী ক্যালিগ্রাফি সমৃদ্ধ বাঁশের বেলকি এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উল্লিখিত বাঁশের বেলকি, দরমায় রীতিবদ্ধ অলংকারবহুল, নকশা রয়েছে। শিল্পী হামিদের বাওঝাপেও শিল্পীর বৈশিষ্ট্যময় রীতিবদ্ধ অলংকারবহুল নকশার সমাহার লক্ষ্যণীয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে লোক ও কারুশিল্প কেবল প্রয়োজনের নয়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৌন্দর্যের। হামিদের বাঁশের বাওঝাপ ও দরমাও তেমনি প্রয়োজনের জন্য তৈরি হলেও এতে লোক ও কারুশিল্পের অলংকারবহুল নকশার ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে এবং শিল্পীর শিল্প-সৌন্দর্যবোধ-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে হামিদের বাঁশের তৈরি বাওঝাপ প্রয়োজন ছাড়িয়ে সৌন্দর্যের শিল্প, বস্তুতেও পরিণত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে শিল্পকলা ইতিহাসবিদ, লোকশিল্পের গবেষক, রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও দেশের, বিদেশের প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীর পর হামিদের তৈরি বাওঝাপ, বেলকি সৌন্দর্যের, নান্দনিক শিল্প সুষমার শিল্পকর্ম হিসেবে আধুনিক ড্রইং রুমে, যাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছে। শিল্পী হামিদ লোকজীবনধারার প্রয়োজনে লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ঐতিহ্যের নিরিখে বাঁশের কারুশিল্প তৈরি করে দেশের লোককারুশিল্প সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নকশী বাওঝাপ, বেলকি, এগুলো শিল্পীর গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরের প্রয়োজনের সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের। এখানে পৃষ্ঠপোষক গ্রাম-গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ লোক সমাজ, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য। স্থানিক ও সময়ের ব্যবধানে শিল্পী হামিদের বাওঝাপ ও বেলকি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিল্প রসিকের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে রূপান্তরিত হয়ে এখন কেবল শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। কেবল সৌন্দর্যের, শিল্প সুষমার হয়েছে।

গ. কলা কৌশল

লোক ও কারুশিল্প নৃগোষ্ঠী সম্পর্কীয় জনজাতির শিল্পকলা বিষয়ক বলে এর সৃষ্টি ও শিল্পের কলাকৌশল ঐতিহ্যিক লোকজীবনধারা-লোকসমাজই লালন করে। অর্থাৎ গ্রামীণ লোকসমাজ আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির কলা কৌশলকে লালন করে, চালু, বজায় রাখে। তার প্রমাণ প্রতিটি ঐতিহ্যিক গ্রামীণ লোকসমাজে দক্ষ কারুশিল্পীদের মধ্যে সনাক্ত করা যায়। জনজাতির শিল্পকলা হিসেবে লোকশিল্পকে এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৌশল, দক্ষতাদ্বারা প্রাকৃতিক উপকরণ, কাঁচামালকে পরিণত করে লোক ও কারুশিল্পে। এই প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের আব্দুল হামিদের তৈরি বাওঝাপ, বেলকি ও অন্যান্য বাঁশের কারুশিল্প এদেশের লোকজীবনধারার, বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের শিল্পকলা লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। গিলন্ড গ্রামের মানুষ তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে চলে আসা গ্রামীণ লোকজীবনধারায় বাঁশের তৈরি কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় প্রাচীন, এখনো প্রবহমান ধারায় অব্যাহত রয়েছে। এখানে অন্যান্য বাঁশের কারুশিল্পীর মত হামিদ বাঁশের কারুশিল্প তৈরির কৌশল এখানকার লোকজীবনধারা- সমাজ কাঠামোর ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকজীবনধারায় গিলন্ড গ্রামের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট অনুসারে

জীবনযাপনের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে বস্তুজাত সংস্কৃতির ধারা-লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশের সকল মানুষই এখানকার বস্তুজাত সংস্কৃতি-লোক কারুশিল্পের সংগে তৈরিতে, ব্যবহারে সম্পৃক্ত। সে কারণে এখানে সকলেই এখানকার কারুশিল্পের তৈরির কৌশল সম্পর্কে কম বেশী জ্ঞাত। লোকমনে-লোকজীবন ধারায় বিস্তৃত, সকলেই কম বেশী জানে বাঁশের, সনের ঘর বানাতে, বাঁশের জিনিস, বেড়া তৈরি করতে, কিভাবে বাঁশের চটা তৈরি করতে হয়। চৌকা ঘর করে বাঁশের বেড়ায় চটা দিয়ে বেড়া বাধতে হয়। বাঁশের বাওঝাপ তৈরি করতে হয়। বেলকি তৈরি করতে হয় বা অন্যান্য বাঁশের জিনিস তৈরি করতে হয়। এসব তৈরির কৌশল হাজার বছর ধরে গ্রামের মানুষ, লোকসমাজ লোকমনে সংরক্ষিত আছে। এই সমাজের কেউ ইচ্ছা করলেই লোকজীবনে হাজার বছর ধরে রাখা তার সাধারণ জানা কৌশলটির উপর দক্ষতা আনতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় আব্দুল হামিদ শৈশব থেকে প্রতিদিনের জীবনযাপনে বাঁশের কারুশিল্পের তৈরির ঐতিহ্যিক ধারাকে যেমন ঘনিষ্টভাবে দেখেছেন তেমনি এই কারুশিল্পকে ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহ্যিক কৌশলের মধ্যে রয়েছে বাঁশের সাধারণ ও চিকন বাত্তি বা বাত্তা তৈরি করা, সলা তৈরি করা, বাঁশের বেড়া তৈরি করা এবং বাধা। এক বাত্তি দিয়ে বাঁশের বেড়া বাধা, এক বাত্তির চৌকনা খোপের বাঁশের বেড়া বাধা, দুই বাত্তি এক সংগে সহ বাঁশের বেড়া বাধা, জানালার জন্য কেচকি বেড়া তৈরি, চিকন কাজের বেড়া, মোটা কাজের বেড়া বাধার কৌশল। বেতের ব্যবহারের কৌশল, বেড়ায় প্রত্যেকটি খোপের নির্দিষ্ট স্থানে এবং প্রতিটি খোপ সৃষ্টির জন্য বাত্তার আড়াআড়ি সংযোগের কত দুরত্বে বন্ধন থাকবে, বন্ধনের গিরো কিভাবে স্থাপন হবে। এবং বাঁশের বেড়ায় বেতের বন্ধনের স্থাপন কৌশল সৃষ্টি করে থাকে নকশার গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যের উপর।

শিল্পী হামিদ তার তৈরি বাঁশের কারুশিল্প বিশেষ করে বাওঝাপ ও বেলকি তৈরির কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে জানালেন যে, যে বাঁশটি বেশী পাকা নয়, অথচ বেশী কাঁচাও নয় মধ্যম ধরনের এমন বাঁশই তার কাজের উপযোগী। বৈরা বাঁশ ও মাখলা বা তল্লা বাঁশই তার কাজে বিশেষ উপযোগী। তিনি প্রথমে চিকন সলা অথবা $\frac{১}{২}$" চ্যাপ্টা বাত্তি তৈরি করেন প্রয়োজন মত। পরে $\frac{১}{৪}$" চওড়া বাঁশের বাত্তি তৈরি করেন। এখানে উল্লেখ্য বাঁশের যে কোন জিনিস তৈরিতে বাঁশ থেকে সলা ও বাত্তি তৈরি করতে হয়। এ জন্য যে কোন বাঁশের কারুশিল্পী সলা ও বাত্তি তৈরি করতে একটি সাধারণ কৌশলকে অনুসরণ করেন। গ্রামের প্রত্যেক কারুশিল্পীর তা জানা। অনুরূপভাবে মানিকগঞ্জের আব্দুল হামিদও তার বাওঝাপ তৈরি করতে তার চার পাশের সকলের জানা কৌশলের

সাহায্যে বাঁশের সলা ও বাত্তি চটা তৈরি করেন। হামিদ জানালেন যে, বাত্তি তৈরির পূর্বে প্রথমে বাঁশ কেটে, দা দিয়ে ফারেন, ফারা বাঁশ রোদে শুকান ১৫ দিন। তারপর পানিতে ভিজিয়ে রাখেন ১৫ দিন। পানি থেকে তুলে শুকিয়ে নেন পাঁচ ছয় দিনে। তারপর ঐ বাঁশ দিয়ে বাত্তি, সলা, ফুল লতাপাতা, ইত্যাদি তৈরি করেন। এ ভাবে বাঁশকে ব্যবহার করলে পোকা, ঘুনে ধরে না, কমে বাড়ে না, কাজের সুবিধা হয়। তিনি আরো জানালেন বেড়া তৈরি করে পুরো বেড়াটি পানিতে ভেজান ১৫ দিন, পরে শুকানোর পর গাবের সংগে খয়ের মিশিয়ে রং দেন। বেড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, ঘুনে, পোকায় ধরে না, স্থায়িত্ব বাড়ে, এসব কৌশল গ্রামের বাঁশের কারুশিল্পীরা জানেন।

জনাব অব্দুল হামিদ বাওঝাপ তৈরির কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন সরুসলা বা বাত্তি তৈরি করে দাও দিয়ে বারে বারে আশ ধারালো দাও এর সাহায্যে ছিলে মসৃণ করে নেন। ৬ বা ৮ ফুট লম্বা সলা একত্রিত করে আড়াআড়ি চার বা ছয়টি সমান্তরাল লাইনে মোটা সুতা বা পাটের সুতার তানা তৈরি করে পরে একেকটি সলা আড়াআড়িভাবে রাখেন, এবং প্রত্যেক লাইনে জোড়া সুতার ফাকে সলা ঢুকান একবারে। এর পর একটি সুতার উপরে অপরটি এভাবেই বুননের মত করে একটি চিকের ন্যায় খাড়া জালি হয়ে যায়। একই কৌশলে মাছ ধরার চাই, চাই বসানোর পর দুপাশে পানি যাওয়ার জন্য বাঁশের সলার লম্বা জালি তৈরি হয়। কৌশল চির চেনা। মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের সাধারণ মানুষের জানা। লোকজীবনে বাঁশের কারুশিল্পের এই কৌশল সচল আছে। তৈরি জালির চারপাশে চিকন বাত্তি উপরে নীচে রেখে চিকন বেত দিয়ে বাধেন। এখন এটি আয়াতাকার ফ্রেমের গড়নের হয়। এরপর শিল্পী হামিদ সুবিধামত একেক সময় একেক রকমের ফুল, লতাপাতাশোভিত অলংকৃত নকশার পরিকল্পনা করেন। প্রধানত ফ্রেমের চারপাশে নকশা সৃষ্টির জন্য অলংকৃত লতা, ফুল সাজান, লতা ফুল বাঁশের। লতা তৈরিতে বাঁশের বাত্তিকে দায়ের আগা দিয়ে ফেরে ফেরে বাত্তির শক্ত কঠিন ভাবের পরিবর্তন আনেন, নমনীয় করে প্যাঁচানো লতার উপযোগী করেন। বাঁকানো ঢেউ খেলানো লতার উপরে ও নীচে পাতা ও ফুল সাজিয়ে নকশা তৈরি করেন। মাঝখানে দুটি পাখি একটি জীবনবৃক্ষের দুই বিপরীতপার্শ্বে ডালে দু'টি পাখী একটি অপরটির মুখোমুখী শিল্পী স্থাপন করেন। পরিণত হয় সুন্দর বাওঝাপ। সলার পরিবর্তে বাত্তি পাশাপাশি রেখে জমিন সৃষ্টি করে, চারপাশে বাত্তি দিয়ে বেধেও বাওঝাপ করেন হামিদ।

নকশা সৃষ্টিতে তিনি আলাদা করে বাঁশ ফালি করেন, ফালি থেকে ধারাল দাও দিয়ে ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা ফুলের পাপড়ি তৈরি করেন, ফুলের মাঝখানের অংশ গোলাকার চাকতি তৈরি করেন বাঁশের ফালি দিয়ে, দা দিয়েই উপরিভাগ মসৃণ করেন। ফুল লতাপাতা

বাওঝাপ সাজাতে ফুলের পাপড়ি, পাতা, লতাপাতা প্রতিস্থাপন, বিন্যাস করেন। বাওঝাপের মাঝখানে কখনো কখনো সুবচন সাজান শিল্পী। যেমন "দুঃখ সুখ", "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"।[১২] আগেই বলেছি শিল্পী আব্দুল হামিদের তৈরি অলংকৃত বাঁশের বাওঝাপ ও বেলকি পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরীতে শিল্পরসিকজনের বাড়ির সংগ্রহে। কেবল নান্দনিক সুষমার, সৌন্দর্যের শিল্পকর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিদেশে শিল্পকর্ম হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর শিল্পবোদ্ধা, কলা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে হামিদের বাওঝাপ সৃষ্টির কৌশলে সামান্য রূপান্তর এসেছে সূক্ষ, মসৃণ, চকচকে হয়েছে। পরবর্তীতে কারুশিল্প সংগঠক ও গবেষক মালেকা খানের উদ্যোগে শিল্পী হামিদকে তার কাজের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক ঢাকায় আয়োজিত ফিলিপাইনের ৮ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়ানো হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল হামিদের বাওঝাপের কাজের গতি বাড়ানো, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করানো এবং ফুল, লতাপাতা লাগসই প্রযুক্তি-সরঞ্জাম দিয়ে দ্রুত মসৃণ করা। মালেকা খান মন্তব্য করেন যে, জনাব হামিদ এই প্রশিক্ষণে অংশ নিলেও প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। অর্থাৎ তিনি তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন। তবে উল্লিখিত প্রশিক্ষণের পর শিল্পী হামিদের কাজ আরো সূক্ষ্ম হয়েছে, বাঁশের ফুল, লতাপাতা আরো মসৃণ হয়েছে। স্থানীয় আঠা ব্যবহারের পরিবর্তে বিদেশী গাম ব্যবহার করেছেন। পূর্বে কখনো কখনো বাওঝাপে, বেলকীতে প্লাষ্টিক ব্যবহার করতেন, এখন তা করেন না। মূলতঃ হামিদ বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যে নিহিত হাজার বছরের চলে আসা বাঁশের কারুশিল্পের কলাকৌশলেকে প্রবহমান রাখার ঐতিহ্যিক কাজটি করেছেন। বিদেশের নতুন কৌশলের যতটুকু তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছেন ততটুকুই, গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে বেশী নয়।

বাওঝাপ ও বেলকি এই দুই ধরনের বাঁশের কারুশিল্পের নকশার সাধারণ গুণ, বৈশিষ্ট্যকে শিল্পী হামিদ অনুসরণ করেছেন। বাওঝাপে আয়াতাকার ফ্রেমের চারপাশে লতাপাতা, ফুল, ফল পাখি সাজিয়েছেন, নকশায় পর পর বসিয়েছেন এবং পুন পুন একই জিনিস সাজিয়ে নকশা তৈরি করেছেন। ফলে তার নকশায় ছন্দ Harmony পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই নকশায় আরবীয়নকশার Arabsque প্রভাব লক্ষ্যণীয়, বাওঝাপের মাঝে আমাদের নকশী কাঁথার জমিনের ও কার্পেটের নকশার ন্যায় জীবন বৃক্ষকে শিল্পী অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া বেলকিগুলোতে শিল্পী কখনো কখনো মাঝখানে একটি কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করেছেন। দুপাশ থেকে ফুল লতাপাতা, পাখি একই আঙ্গিকে মাঝখানে একটি অপরটির মুখোমুখি হয়েছে। এতে নকশায় দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসম গুণ (Symmetry) এসেছে।

ঘ. সৃষ্টিতে বিষয়গত দিক

হামিদ বাওঝাপ ও বেলকি তৈরির কাজই বেশী করে থাকেন। এই দুই ধরনের কাজেই তিনি নকশা করেন। তার অনুভব ও চেতনা নকশায় বিধৃত হয়। তিনি নকশায় অলংকারবহুল ফুল, ফল, লতা, পাখিকে ব্যবহার করেছেন। বাওঝাপে তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু, মানুষের জীবন পরিক্রমার চিত্রকল্প জীবনবৃক্ষ যা নকশী কাঁথায় এমনকি ইরানে, তুরস্কের কার্পেটের নকশাও পরিলক্ষিত হয় তা হামিদ তার বাওঝাপে নকশা সৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। সুখ ও দুঃখ এই নিয়ে জীবন তা তিনি বাওঝাপে দুটি পাখি বিপরীতভাবে উপস্থাপন করে নকশায় দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমগুণ সৃষ্টির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এসব কাজে তার জীবন যাপনে লোকজীবন ধারা, জীবনাচারণ যেমন লোকশিল্পের সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে, অপর দিকে তার জীবনের সাত্ত্বিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি, ইমামতি, ও ইসলামী শিক্ষা তাকে তার শিল্পের বিষয়গত দিককে এভাবেই প্রভাবিত করেছে। এভাবেই বিষয়ের বৈচিত্রে হামিদের তৈরি বাওঝাপ নিছক আর দশটা বাওঝাপ থাকেনি রূপ লাভ করেছে হামিদের বাওঝাপে।

ঙ. সৃষ্টিতে গড়নগত দিক

হামিদের তৈরি বাঁশের নকশী বাওঝাপ ও বেলকির গড়ন মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের ঐতিহ্যের, লোকজীবনের। এখানে সকল বাড়িতেই একই গড়নের বাওঝাপ ও বেলকি ব্যবহৃত হয়। বাওঝাপের আকার সাধরণত ৮ ফুট দৈর্ঘ্য ৪ ফুট প্রস্থ এর কম বেশীও হতে পারে। বেলকি ঘরের সামনের অংশের দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা আর প্রস্থ ২.৫ থেকে ৩ ফিট। এর ব্যবহার মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের লোক জীবনধারায়, সচল। অর্থাৎ ঘরে ব্যবহৃত হয়। এর সংগে লোকজীবনধারা সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ বাঁশের কাজ হয়ে থাকে। বাওঝাপের কাছাকাছি দরমা বা মাঝট এবং বেলকি ময়মনসিংহ, রংপুর, ফরিদপুর অঞ্চলের বাঁশের কারুশিল্পীরা করে থাকে। এসব গড়ন আমাদের লোকজীবনে ঘর বাড়ি তৈরির ধারায় নির্ধারিত। সেই ঐতিহ্যের অনুসারি আব্দুল হামিদ।

পরবর্তীতে যখন দেশের আধুনিক কলারসিক, শিল্পবোদ্ধা, লোকশিল্প বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, ঢাকাসহ বিদেশে শিল্পীর কাজ সংগৃহীত হতে শুরু হলো, তখন থেকে অর্থাৎ ১৯৮৬ সাল থেকে শিল্পী হামিদের তৈরি ঐতিহ্যিক লোকশিল্প বাওঝাপ, বেলকির গড়নে পরিবর্তন সূচিত হল। নগরীতে বাওঝাপ পরিণত হলো সৌন্দর্যের নান্দনিক শিল্প সুষমার বস্তু হিসেবে। ব্যবহারগত পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। দরজা জানালার পর্দার উপরে কাঠের ব্রাকেটের স্থানে পেলমেট হিসেবে বাঁশের ছোট কাজে, ঘরের বিদেশী ফার্নিচার বা পার্টিশনে ঘর সাজানোতে, দোকান সাজানোতে হামিদের বৈশিষ্ট্যময় বাঁশের কাজ ব্যবহার হওয়ায় এর গড়নে নব নব রূপান্তর ঘটেছে। শিল্পী আধুনিক নগরীর ব্যবহারকারীর

ফর্মায়েস অনুসারে তার ঐতিহ্যিক কৌশল ও দক্ষতাকে সম্বল করে নতুন গড়নের নকশী বাঁশের কাজ করেছেন, নাগরিক জীবনে লোক জীবন ধারার ঐতিহ্যের এই বাঁশের শিল্পকর্ম টিকে থাকতে পারবে কিনা তা গবেষণার বিষয়।

মূলতঃ হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্প বাওঝাপ, বেলকি এদেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের। যুগযুগ ধরে আমাদের লোকজীবনধারায় লালিত। বাঁশের কারুশিল্প তৈরির কৌশলের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হামিদের তৈরি বাঁশের কারুশিল্পকে এ সময়ের চাহিদার, আকর্ষণীয় করে তুলতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে জাপানের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করা যেতে পারে। সেখানে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁশের কারুশিল্পের ব্যবহার প্রাচীন ধারায় সীমাবদ্ধ রাখেনি। বাঁশেরকারুশিল্পের মত ঐতিহ্যিক কারুপণ্যকে বিশ্ব বাজারের উপযোগী করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজিয়েছে। ফলে বাঁশের কারুশিল্প যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে, তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদার প্রতীকও বটে। অনুরূপ অভিজ্ঞতা চীন, ফিলিপাইন ও কোরিয়ার। এ প্রসংগে মানিকগঞ্জের হামিদের বাঁশের কারুশিল্প বাওঝাপ ও বেলকিতৈরীর কৌশল ও নকশার দক্ষতাকে এ যুগের দেশের বিদেশের প্রয়োজনে সৌন্দর্যের বস্তু তৈরিতে সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীদের বিষয়ে নিম্নলিখিত পর্যায়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১. দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকশিল্পের দক্ষ কারুশিল্পীদের উপাত্ত তৈরিকরা।

২. বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও কারুশিল্প তৈরির কৌশল, অলংকরণ পদ্ধতি ও দক্ষতার বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারে ঐতিহ্যিক দিক দলিলীকরণ।

৩. লোকশিল্পের বহুমাত্রিক ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পৃথক জাতীয় নকশা ইনষ্টিটিউট গঠন করা প্রয়োজন। লোকশিল্পের নকশার সম্ভাবনা ও আধুনিক জীবনে এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৪. লোক কারুশিল্পের ব্যবহারকে জাতীয় জীবনে জনপ্রিয় করা, মর্যাদার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে এর বাজার জাতকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং একই সংগে আন্তর্জাতিক বাজারে লোকশিল্পের বাজারজাত করণের লক্ষ্যে লোককারুশিল্পের একটি জাতীয় বাজারজাতকরণের প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান ঢাকায় একটি লোক ও কারুশিল্পের স্থায়ী প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে পারে। বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান কারুশিল্পীদের সংগে দেশের ও বিদেশের ক্রেতা, ব্যবসায়ীর সংগে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে।

৫. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের দক্ষ বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদের মত অগণিত শিল্পী ও কারিগর অবহেলিত। অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পতিত।

তাদের কারুশিল্পের কদর এখন তেমন নেই, তাদের জানা লোকশিল্প তৈরির কৌশল, দক্ষতা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ, ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরজ্জীবন প্রয়োজন। উল্লিখিত দক্ষ লোক ও কারুশিল্পীদের কল্যাণে জাতীয় পর্যায়ে একটি কারুশিল্পী কল্যাণ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের "কারুশিল্পগ্রাম" কর্মসূচীতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীগনের কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে সংযোগের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

মানিকগঞ্জের গিলন্ড গ্রামের বাঁশের কারুশিল্পী হামিদের পারিপার্শ্বিকতা, লোকজীবনধারায় বাঁশের কারুশিল্পের অবস্থান, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের কারুশিল্পীর অবস্থা ও অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন কারুশিল্পী যে কেবল ব্যক্তি কারুশিল্পী নয় তার সংগে আবহমান বাংলার লোকজীবনের, লোকজীবন ধারা- লোকসংস্কৃতিসম্পৃক্ত, হামিদের বাঁশের কারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তারই প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. Felix M. Keesings, Cultural Anthropology. 1965: 197

২. সৈয়দ মাহবুব আলম "বস্তু সংস্কৃতির দলিলীকরণঃ প্রেক্ষিৎ লোক কারুশিল্প মেলা লোকজ উৎসব '৯৬" বজলুর রহমান ভূঁইয়া সম্পাদিত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

৩. Encyclopaedia Britannica Vol-19 Ed-1986.

৪. Lowie. R. R. H. 1940.

৫. Encyclopaedia Britannica Vol-19 Ed-1986.

৬. Yulian Bromley and Alla Ter-Sarkisyants "Main Directions of Soviet Ethnographic Research" Social Sciences vol-3. 1983 USSR Academy of Sciences.

৭. Hazel berger. Herta. 1961. " Method of Studying Ethnological art" Current Anthropology 2: 341-384.

৮. জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা, বৌদ্ধ দেবী মূর্তি সিতাতপত্রা, কালো পাথরের, আনুমানিক দশম শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থান, দিনাজপুর, সংগ্রহ নম্বর ১১১৫।

৯. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন যাদুঘর, সোনারগাঁও, নকশী দরমা, ময়মনসিংহ, আনুমানিক ৭০ বছরের পুরানো, প্রাপ্তিস্থান ময়মনসিংহ সংগ্রহ নং-৭৬ (৭) ১০।

১০. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন যাদুঘর সোনারগাঁও, নকশী দরমা, ময়মনসিংহ, আনুমানিক ৭০ বছরের পুরানো, প্রাপ্তিস্থান ময়মনসিংহ সংগ্রহ নং-৭৬ (৭) ৯।

১১. তোফায়েল আহমদ, লোকশিল্পের ভুবনে, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

১২. মালেকা খানের ব্যক্তিগত সংগ্রহে উল্লিখিত সুবচন, ও বাংলা কবিতা সম্বলিত শিল্পী হামিদের বাওঝাপে রয়েছে।

লোক ও কারুশিল্প, লোক মেলা, লোকজ উৎসব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ

সারা বিশ্ব অনেকগুলো প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত। প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের মধ্যে এক একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলের পরিসীমায় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহকে সনাক্ত করা যায়। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংগে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত। কারণ প্রত্যেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিবেশে বিদ্যমান ও টিকে থাকে। এবং বিকশিত হয়। এজন্য সাংস্কৃতিক অবস্থা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে তার বসবাসের, জীবনযাপনের পরিবেশ এবং জীবনধারা সৃষ্টি করতে হয়। অর্থাৎ মানুষকে জীবনযাপনে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল উপাদানকে ব্যবহার করে, কাজে লাগিয়ে একটি অপ্রধান, গৌণ অথচ সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়[১]। (M.Keesing 1965:197) এতে এটাই স্পষ্ট যে, মুখ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় মানুষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃস্টি করে।

মূলতঃ প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাকৃতিক পদার্থ যেমন মাটি, পানি, বাতাস, আগুন অর্থাৎ রাসায়নিক পর্দার্থ-জৈব ও অজৈব এই পদার্থ নিয়ে গঠিত প্রকৃতি। মানুষ জীবনযাপনের প্রয়োজনে নিজেকে মানিয়ে কখনো এর উপাদানগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে গৌণপরিবেশ-জীবনধারা সৃষ্টি করে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে সাংস্কৃতিক বস্তু সংস্থানের (Cultural Ecology) ধারায়। এভাবেই একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অবস্থা নির্মিত হয়। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্রময় প্রাকৃতিকপরিবেশের পরিসীমায় মানুষের তৈরি সাংস্কৃতিকপরিবেশ-জীবনধারা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক অবস্থায় রূপ লাভ করে। এবং সেই সকল অঞ্চলকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা কালিক ব্যবধানে সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্টের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মানুষের তৈরি গৌণ পরিবেশ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রাথমিক পর্যায়ের রূপটি ইতিহাস পূর্বকালে মানুষের জীবন ধারায় ছিল। ইতিহাস পূর্বকালে মানুষের গড়ে

তোলা যে পরিবেশ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে রূপলাভ করেছিল তার অবশেষ ক্ষীণ ধারাকে আজ অবধি টিকে থাকা অক্ষরজ্ঞানবিহীন বৈশিষ্ট্যের আদিবাসী, উপজাতি সমাজ ধারণ করে। এমনকি ক্রমপুঞ্জিত ধারায় রূপান্তরিত রূপের অব্যাহত ধারাটি গ্রামের লোকসমাজও ধারণ করে। মূলতঃ ইতিহাসপূর্বকাল থেকে আজ অবধি আদিবাসী, উপজাতি ও গ্রামীণ লোকসমাজ পর্যন্ত প্রাকৃতিকপরিবেশে মানুষের তৈরি গৌণপরিবেশকেন্দ্রিক জীবনধারা সাংস্কৃতিক অবস্থায় একটি ধারাবাহিকতা সনাক্ত করা যায় এবং ক্রমপুঞ্জিত ধারায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তা অব্যাহত। সাংস্কৃতিকপরিবেশের ধারাবাহিকতা, ক্রমপুঞ্জিত ধারায় রূপান্তর প্রক্রিয়া কালিক ও স্থানিক ব্যবধানে সূচিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বস্তুজাতসংস্কৃতি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ও কাঁচামালকে ব্যবহার ও কাজে লাগিয়ে যে পরিবেশ, জীবনধারা-সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মিত হয় তার বাহ্যিক রূপকে প্রত্যক্ষ করি সংস্কৃতি ও জীবনধারাকেন্দ্রিক নানা বস্তুতে, জিনিসে বা বস্তুজাত সংস্কৃতিতে। মূলতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, উপাদান যখন সাংস্কৃতিক বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তখন তা বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়। বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু স্পর্শ দ্বারা বোধগম্য। এর সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে এতে মানুষের প্রয়োজন, চিন্তা, চেতনা, মূল্যবোধ, ধর্ম আচার-আচরণ একীভূত হয়। অর্থাৎ বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু মানুষের সৃষ্টি জীবনধারা- সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত বলে এই বস্তু কেবল বস্তু নয়, এই বস্তু সাংস্কৃতিক, জীবনধারা সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃতি মানুষের মেধা, বিচারবুদ্ধি, ভাবমূলক বিমূর্ত, নির্বস্তুক চিন্তা সংক্রান্ত, ফলে সংস্কৃতি কখনো বস্তু হতে পারে না, কিন্তু বস্তু সাংস্কৃতিক হতে পারে এবং এই সাংস্কৃতিক বস্তু যা বস্তুজাতসংস্কৃতি। বস্তুজাতসংস্কৃতি মানুষের জীবনযাপন ধারাসংক্রান্ত জ্ঞানের অসংখ্য ক্ষুদ্রাংশকে অন্তর্ভূক্ত করে। এবং ঐ জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশসমূহ মানুষকে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু নির্মাণে পরিকল্পনা, কৌশল ও কারণ নির্ধারণ করে দেয়। এই বস্তু দেখা যায় এবং ছোয়া যায়। মূলতঃ মানুষের তৈরি বস্তুর সংগে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের স্বভাব, আচার-আচরণের এবং জীবন ধারার-সংস্কৃতির সংযুক্তি সাধনের বিশেষ গুণ, বৈশিষ্ট্য, বস্তুজাতসংস্কৃতিতে, বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তুতে বিদ্যমান, সক্রিয়। প্রকৃতির কাঁচামাল, উপকরণ দিয়ে দক্ষ, নিপুণ হাতের পরিচালনায় ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত কৌশল প্রয়োগ করে বস্তুতৈরি করা হয়। প্রতিটি বস্তু তৈরির উপকরণের মৌলিক গুণ, বৈশিষ্ট্যসহ এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার বা গড়ন রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের, শ্রেণীর বস্তুর সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক উপকরণের গুণ, বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল। এবং সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় প্রাকৃতিক উপকরণের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বস্তু

সৃষ্টিতে ঐতিহ্যিক লোকজীবনধারাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট, উপযোগী বলে লোকসমাজে সকলের গ্রহণযোগ্য, যথাযথভাবে স্থিরকৃত, নির্ধারিত গড়ণ সম্বলিত নমুনাসমূহকে অনুসরণ করা হয়। যেমন লাঙ্গল, দা, কাস্তে, চাকা, ঝুড়ি, পাটি, মাথাল, নৌকা, মৃৎপাত্র, মাটির-বাশের ঘর, বাঁশের বেড়া, হুক্কা, কাঠের ও নারকেলের মালার চামিচ ইত্যাদি । অপেক্ষাকৃত অধিকগুণ সম্পন্ন বস্তুর আকার, গড়নে কারুশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট উপযোগিতার গুণ ছাড়াও সম্ভবতঃ নকশায় সূক্ষতা, প্রতিসমগুণ, গড়নে পরিমার্জনার গুণ যুক্ত হয়। এবং বস্তু কারুশিল্পের গড়নের আকর্ষণীয় দিকও এতে কায়িক পরিশ্রম, চেষ্টার প্রকাশ স্পষ্ট, দৃশ্যমান।

বস্তুজাত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

একটি বস্তুর স্বাভাবিক ব্যবহারিক দিক, বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বস্তু বা কারুশিল্পের রয়েছে ব্যবহারিক দিক, তৈরির উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা। যদি কোন নৃগোষ্ঠী কোন কারণে কালিক ব্যবধানে অদৃশ্য, হারিয়ে বা লুপ্ত হয়ে যায় তা হলে তাদের তৈরি বস্তু, কারুশিল্পের নিদর্শন আপাততঃ বাহ্যিক বস্তু হিসেবে, বস্তুজাত সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু তাদের শারীরিক কর্মশক্তি, অনুভব, চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি স্বভাব-আচরণগত বৈশিষ্ট্য অপ্রচলিত, তামাদি হয়ে পড়বে। কেবল জাতিতত্ত্ব, লোক ও লোকশিল্প যাদুঘরের গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রদর্শন গ্যালারিতে যাদুঘর বিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতির নিরিখে ডিয়োরামা ও অন্যান্য প্রদর্শন পদ্ধতি এবং বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংশ্লিস্ট সংস্কৃতির স্বভাব-আচরণ, জীবনধারা কিভাবে বস্তুর-কারুশিল্পের নিদর্শনে আরোপিত, স্থির, নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট তা দর্শকদের অবহিত করতে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন।

মূলতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে তার তৈরি গৌণ পরিবেশের জীবনধারা অব্যাহত রাখতে খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান, যোগাযোগ নিশ্চিত করতে যেসব জিনিস, বস্তু, ঐতিহ্যিক কৌশল ও দক্ষতায় তৈরি করার প্রয়োজন হয় তা বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। এতে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় মানুষের জীবনধারার অঙ্গ শারীরিক কর্মশক্তি, অনুভব, চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব-আচরণগত বৈশিষ্ট্য-সংস্কৃতি। এ জন্যই বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তুই কারুশিল্প-লোকশিল্প। মানুষের "মানসিক অস্থির চিত্ত" কৌতুহল, এবং বৈচিত্রের স্বাদ বস্তু জিনিস-কারুশিল্প তৈরিতে আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়িয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত অনুভব মানুষকে তাড়িত করে। ফলে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু কারুশিল্প বৈশিষ্ট্যময় গড়নের নকশাগুণসম্পন্ন। বস্তুজাত কারুশিল্প প্রয়োজন ছাড়িয়ে নকশা গুণেরও। এই প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক মরিস বলছেন যদি নকশাগুণের শিল্পকলার অস্তিত্ব মানবসংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তা হলে মানুষের ভারসাম্যের সুসামঞ্জস্যতা, প্রতিসমগুণ, ছন্দগুণ এই অনুভূতি মানুষের পূর্ব পুরুষ

প্রিহোমিনিড মানুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে[২]। (Morris: 1962) মানুষের মধ্যেকার উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অনুভূতি বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প তৈরিতে মানুষ প্রয়োজন ছাড়িয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে এতে নকশাগুণ আরোপ করেন। এ প্রসংগে নৃতাত্ত্বিক ফ্রান্স বোয়াসের মন্তব্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের মধ্যে সুষমতা, ভারসাম্যগুণ এবং সমরূপ নিয়মিতগুণ এই Balance ও Regularity এই অনুভূতি বস্তু, কারুশিল্পে নকশা প্রকাশের পথ পেতে পারে। এবং এইভাবে নকশার বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসমগুণ দ্বারা[৩]। (Bilateral symmetry) (Boas 1955:33) এ প্রসংগে বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনের গড়নে ও সম্পূর্ণতার ব্যহ্যরূপ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক লুই বলছেন যে, বস্তু, কারুশিল্প সরাসরি উপযোগিতার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। অর্থাৎ বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে উপযোগিতার গুণ, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আছে অসাধারণ বাড়তি মাত্রার প্রতিসমগুণ, সুরুচিসম্পন্ন, সুন্দর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলের পরত।[৪] (Lowie, R. H: 1940) বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প মানুষের জীবনযাপনের উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুষঙ্গ। বস্তু, কারুশিল্পের বাহ্যিক রূপে ও গড়ণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ও মানুষের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য যুগপৎ ক্রিয়াশীল। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে মানুষের কৌশল ও দক্ষতার গুণ এবং সৌন্দর্য, ছন্দ ও নকশাগুণ। বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, নৃগোষ্ঠীর ভিন্নতা বিচিত্র ধরনের বৈশিষ্ট্যের বস্তুজাতসংস্কৃতির উদভাবন ঘটিয়েছে। বস্তুজাতসংস্কৃতি-বস্তু, কারুশিল্প যেহেতু মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সৃষ্ট একটি গৌণ পরিবেশের (সাংস্কৃতিক) অনুর্ভূক্ত, সেহেতু বস্তু, কারুশিল্প মানুষের জীবনযাপনের, কাজকর্মকেন্দ্রিক। যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় এদেশের মানুষকে তার জীবনযাপনের গৌণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অনিবার্যভাবে কৃষিকাজ, মাছধরা, মাটির হাঁড়ি, পাতিল তৈরি করা, নৌকা বানানো, তাঁতবোনার কাজকে বেছে নিতে হয়েছিল এবং এসব কাজ করতে গিয়ে বৈশিষ্ট্যের বস্তু, কারুশিল্প, বস্তুজাতসংস্কৃতির উদভব ঘটিয়েছিল এদেশের মানুষ। এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণ, কাঁচামাল, কৌশল-প্রযুক্তি, দক্ষতা, অনুভব ও চেতনায় বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু- কারুশিল্প গড়ে, সৃষ্টি করে।

এসব বস্তু, কারুশিল্পের মধ্যে রয়েছে লাঙ্গল, মাছ ধরার চাই, নৌকা, খালই, মাথাল, পলো, সুতি কাপড়, সন, পাটের দড়ি, মাটি, বাঁশ, সনের ঘর, কুলা, ঢেকি ইত্যাদি। মূলতঃ এ দেশের প্রকৃতিকেন্দ্রিক মানুষের তৈরি সাংস্কৃতিক পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উল্লিখিত বস্তু, কারুশিল্প-বস্তুজাতসংস্কৃতি। এসব বস্তু-কারুশিল্প এদেশের মানুষের জীবনধারার উপযোগিতার নিরিখে বাংলাদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর কৌশল, দক্ষতা, অনুভব ও

চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে এদেশে আগত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এদেশের বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে যুক্ত হয়েছে। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ার বস্তু, লোকশিল্প, কারুশিল্প রূপান্তরিত হয়ে কালিক ব্যবধানে আজঅবধি প্রবহমান রয়েছে

লোকশিল্প, বস্তুজাত সংস্কৃতি ও গ্রাম

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশের মানুষের জীবনযাপনের পরিবেশ, জীবনধারা বাংলাদেশের গ্রামগুলো ধারণ করে আছে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের বৃহত্তম অংশ গ্রামেই আজো এদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগোরিষ্ঠ অংশ বসবাস করে। তাদের জীবনধারায় প্রাচীনকাল থেকে আজঅবধি সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে। এভাবেই বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প-লোকশিল্পের ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিকতার প্রবহমান ধারাটি এখনো গ্রামের লোকসমাজের সাধারণ মানুষ ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে রক্ষা করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বস্তুজাতসংস্কৃতি-বস্তু, কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারার রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনধারাই আবহমান বাংলার লোকজীবনধারা-লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ফলে বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রকৃতি, পরিবেশে কৃষির উপর ভিত্তি করে গ্রামের মানুষ জীবনযাপনের একটি ধারাবাহিক ক্রমপুঞ্জিত প্রবহমান জীবনধারা, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, বজায় রেখেছে। গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের প্রবহমান ধারাটি এদেশের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ও বস্তুজাতসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রধানত তিনটি ধারার মাধ্যমে সৃষ্টির পথ পায়। (১) বস্তুজাতসংস্কৃতি (২) বাক সংস্কৃতি (৩) আংশিক বস্তু ও বাক সংস্কৃতি, এই তিনটি ধারা যথাক্রমে বস্তু-লোক কারুশিল্পে, লোকসাহিত্য ও সংগীতে এবং লোক খেলাধূলা ও অভিনয়ে সৃষ্টির পথ পায়।

বাংলাদেশের লোকজীবনধারা এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় বিকশিত ও চলমান। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁচামাল, উপকরণ দিয়ে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে, বাঁচার, চলার প্রয়োজনে নানা জিনিস, বস্তু গড়ে , সৃষ্টি করে। এদেশের প্রকৃতির সহজলভ্য বাঁশ, বেত, কাঠ, মাটি, ঘাস, সন, পাট, তুলা ইত্যাদি কাঁচামাল দিয়ে বাংলাদেশের লোকজীবন ধারার বৈশিষ্ট্যের জিনিস,বস্তু-কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে রূপলাভ করেছে বাংলাদেশের বস্তুজাতসংস্কৃতি। ধারণ করে আছে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগিতা, অর্থনৈতিক দিক এবং সৌন্দর্যগুণ। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কালিক অথবা স্থানিক ব্যবধানে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্প সাধারণ উপযোগিতা থেকে

সৌন্দযগুণে রূপান্তরিত হয়। বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প কেবল কারুশিল্পই নয় এগুলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনাচারণ, কায়িক পরিশ্রম, কর্মকান্ড, অনুভব, চেতনা, অভিপ্রায়কে ধারণ করে আছে। বাঁশ, বেত, মাটি, কাঠ, তুলা, পাট, ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরি বস্তুজাত-সংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্প এদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। গ্রামের লোকজীবন ধারায় সচল রয়েছে। লোকজীবন ধারার সকল স্তরে, কর্মকান্ডে আর্থ- সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহারকে করেছে নিশ্চিত ও বেগবান। একদিকে উপযোগিতা অপরদিকে সৌন্দর্যের, সুষমার বস্তু, কারুশিল্প এদেশের বস্তুজাতসংস্কৃতিকে করেছে বৈশিষ্টময়।

লোকজীবন ধারা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে এদেশের মানুষের সৃষ্টি গৌণপরিবেশ– জীবন ধারা– সাংস্কৃতিক পরিবেশ এদেশের গ্রামগুলো আজো ধারণ করে আছে। এই জীবনধারা বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই জীবন ধারা গ্রামবাংলার লোকসমাজের বৈশিষ্ট্যে আবহমানকাল ধরে লালিত। এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি প্রচলিত নিয়মনীতি প্রথা, অভ্যাসের চিত্র। তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই পরিদৃশ্যমান। গ্রামীণ মানুষের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় গঠিত জীবন-চক্র বা জীবনবৃক্ষ দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । জ্ঞাত, অজ্ঞাতসারে আমাদের গ্রামীণ মানুষকে প্রতিদিনের কার্যকলাপে গ্রামীণসমাজব্যবস্থার সাধারণ অলিখিত নিয়ম-জীবনধারা, আচার, অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে। একটি অলিখিত নিয়ম। এই অলিখিত নিয়ম-জীবনধারার দ্বারা বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের জীবন, জগৎ, সংস্কৃতি পরিচালিত হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতির সাধারণ অলিখিত জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিৎ বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, গ্রাম, নদীনালা, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি এবং কৃষি। লোকসংস্কৃতির অলিখিত নিয়ম, প্রেক্ষিত, ক্ষেত্র গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জানা। এই জানা আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বন, কৃষিব্যবস্থা ও জীবনের নানা খুটিনাটি, সমাজের প্রয়োজনীয় নিয়ম শৃংখলা, নারী পুরুষের সম্পর্ক, মানুষের হাত ও হাতিয়ার এবং মননের সমন্বিত কর্মপ্রবাহের রূপ-বস্তুজাত সংস্কৃতি-লোককারুশিল্প। এজন্যই বস্তুজাতসংস্কৃতি- বস্তু, লোকশিল্প, কারুশিল্প, লোকজীবনধারার, সাংস্কৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক।

লোকজীবনধারার এই অলিখিত নিয়ম অব্যাহত ও প্রবহমান রেখেছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজ-লোকসমাজ। শত,সহস্র বছর ধরে গ্রামীণ লোকসমাজের সাধারণ মানুষ দ্বারা এই অলিখিত নিয়ম জীবনধারা লোকসাংস্কৃতিক উপাদান বস্তু, লোক ও

কারুশিল্প পরিশীলিত, পরিমার্জিত এবং সূক্ষ রূপান্তরের মাধ্যমে সকল সময়ের ও কালের প্রয়োজনের, উপযোগিতার এবং সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে টিকে আছে। জীবনধারা-লোক সংস্কৃতির উপাদান ও অবস্থায় সৃষ্টি বস্তু লোক ও কারুশিল্প উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রবহমান।

লোকজউৎসব, মেলা

লোকজীবনধারার সংগে সম্পৃক্ত লোকসমাজের প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ, সামাজিক রীতিনীতি (custom) মূলতঃ অতিপ্রাকৃত শক্তি, দৈববাণী, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কৃতিসংশ্লিষ্ট। লোকসমাজের প্রথায়, অভ্যাসে তার স্ফূরণ ঘটে। ফলে (custom) সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজের সংগে (superstitions) অন্ধ বিশ্বাসের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অন্ধ বিশ্বাসের মত সামাজিক প্রথাতেও লোকসংস্কৃতির বাকজাতীয় (verbal) ও বস্তুজাতীয় (non verbal) উপাদান বর্তমান। লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুনির্দিস্ট অবস্থায় তা প্রয়োগযোগ্য।

অতএব লোকসমাজের প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ রীতিনীতি, ব্যক্তিমানুষের ও সমাজের গোষ্ঠী মানুষের আচরণ, অভ্যাসের ঢং, ধরন ও পন্থা একটি ঐতিহ্যিক ধারা, নিয়ম। এই প্রথা, অভ্যাস কালিক ব্যবধানে অনুকরণ, অনুসরণের মধ্য দিয়ে অব্যাহত, সচল থাকে। ক্রমাগত সামাজিক চাপ, ব্যবহারে, পালনে সার্বজনীনতা লাভ করে এবং পূর্বপুরুষের অধিকারের তাগিদ, সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ লোকসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়। যখন প্রথা কোন আমোদের দিনকে নির্দিষ্ট করে দিনকে ঘিরে আমোদ হয় তা পরিণত হয় পঞ্জিকার অন্তর্ভূক্ত প্রথায়। যখন এ ধরনের আমোদের, আনন্দের দিনকে ঘিরে কোন প্রথা পুরো লোকসমাজের মানুষ বার্ষিকভাবে উদযাপন, অনুষ্ঠান করে, তা পরিণত হয় পরিপূর্ণ উৎসবে[৫]। (Brunvand J. H.: 1969)

মুলতঃ লোকজীবনে (folk life) কোন লোকসমাজের মানুষের ঐতিহ্যিক দিক লোকসাহিত্য, লোক সংগীত, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্প। এ কারণে লোকজীবনের অন্তর্ভূক্ত প্রথা (Custom) লোকসমাজের মানুষের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বার্ষিক আমোদের , আনন্দের অনুষ্ঠান-উৎসবের গুরুত্ব সাংস্কৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক । বার্ষিক আমোদ ও আনন্দকেন্দ্রিক উৎসবের (festival) প্রথা (custom) কখনো ধর্মীয়, কখনো ধর্মনিরপেক্ষ। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের যে প্রথা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নবান্ন, নববর্ষ এবং পৌষউৎসব, মেলা। এছাড়া ধর্মীয় ঈদ, মহররম, বিভিন্ন পূজা, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব মেলা। এসব দিনে উৎসব, মেলা আয়োজনের ঐতিহ্যিক প্রথা আমাদের লোকজীবনের ঐতিহ্য। এভাবেই

উৎসব, মেলা আয়োজন সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সামাজিক প্রথাই উৎসবের, মেলার আয়োজনের মূল। প্রথায় সংযুক্ত রয়েছে বাকসাংস্কৃতিক ও বস্তুজাতসাংস্কৃতিক উপাদান। অতএব প্রথা পালনের জন্য আয়োজিত উৎসবে লোকসংস্কৃতির বাকসংস্কৃতি ও বস্তুসংস্কৃতি, লোক ও কারুশিল্পের মত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের আদান প্রদান উৎসব, মেলার প্রধান কার্যক্রম। ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় লোকজীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উৎসব, মেলায় গ্রামের সাধারণ মানুষ তার সাংস্কৃতিক উপাদানের আদান প্রদানের লক্ষ্যে মিলিত হয়, আমোদ ও আনন্দকে উপলক্ষ্য করে। এভাবেই উৎসব, মেলা একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। লোকজীবনধারায় প্রথা হিসেবে লোকজউৎসব, মেলা লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিকউপাদান সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আজঅবধি সক্রিয়, প্রবহমান এবং অব্যাহত।

গ্রামীণ লোকজীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকমেলা। প্রতি বছর নানা পাল-পার্বণে ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আয়োজিত লোকমেলার রয়েছে লোকজীবনের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। এবং লোকজীবন ধারার পরিচায়ক বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের প্রসার, উৎকর্ষ, যোগযোগ, বাজার ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র লোক মেলা। উপলক্ষ্য হিসেবে কখনো ধর্মীয়, কখনো কৃষিভিত্তিক জীবনের আচার অনুষ্ঠানগত রূপের পরিসীমায় মেলা আয়োজন করা হয়। এভাবেই মেলা একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ লোকজীবনের সার্বিক উন্নয়নকে মেলায় তুলে ধরা, ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। সেই সংগে লোকসমাজের সকল স্তরের বয়সের মানুষের মধ্যকার একটি বাস্তব যোগাযোগ, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক। ফলে মেলা হয়েছে আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের অতি পরিচিত, প্রাণের, জীবনের আনন্দের ক্ষেত্র। এভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির লালন, রূপান্তরের ক্ষেত্রই বলা চলে মেলাকে।

বাংলাদেশের মেলা এদেশের মানুষের গোষ্ঠীগত চেতনার নানা প্রাচীন অনুষঙ্গ, চিত্র, বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যের নানা দিকের অজানা তথ্য, তত্ত্ব আবিস্কারের অবশেষ ক্ষেত্র। মেলা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যে ধরনেরই হোক না কেন গ্রামীণ পরিবেশের মানুষের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খা, উন্নয়ন, মেলার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ লোকসমাজের চাহিদার উপর ভিত্তি করেই মেলার চালচিত্র, বৈশিষ্ট্য সৃজিত হয়ে থাকে। জীবনের প্রাত্যহিকতাকে পরিপূর্ণ করতে একদিকে কৃষি উপকরণ, অপরদিকে দক্ষ হাতের তৈরি বস্তু, দ্রব্য-লোক ও কারুশিল্পের বিনিময়, লেনদেন মেলার একটি বড় কার্যক্রম।

আর্থ- সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে লোকজীবনে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান, চলার পথে মেলা এবং সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নকে অবলোকন করার আনুষ্ঠানিক আয়োজন হচ্ছে লোকমেলা। লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান, অবস্থা বস্তুজাতসংস্কৃতি- লোক ও কারুশিল্পের প্রসার ও আদান প্রদানের ক্ষেত্র লোকমেলা বাংলাদেশের মানুষের লোকজীবনধারার সংগে সম্পৃক্ত।

বস্তুজাতসংস্কৃতি, লোকজ উৎসব ও মেলা

লোকজউৎসব, মেলা লোকজীবনের প্রথা, সংস্কার। লোকজউৎসব ও মেলা লোকজীবনের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও জীবনধারণকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা। ফলে উৎসব ও মেলা ধারণ করে আছে লোকসংস্কৃতির সকল উপাদান- বস্তু, বাক এবং আংশিক বস্তু ও বাক সাংস্কৃতিক উপাদান। মুলতঃ লোকসমাজের প্রতিদিনের জীবনযাপনে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণকে মানুষ তার বসবাস, জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশের প্রয়োজনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত এবং সৃষ্টি করে। বস্তু হয় জীবনযাপনের, লোকজীবনের জীবনধারার অনিবার্য অংশ। বস্তু পরিণত হয় সাংস্কৃতিক উপাদানে। সব মিলিয়ে এই বস্তুকে সনাক্ত করি বস্তুজাত সংস্কৃতি বলে। বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু লোকজীবনের জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে এর সঙ্গে লোকজ উৎসব ও মেলাও সম্পৃক্ত। আর বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু, জিনিস লোকসমাজের সাধারণ মানুষের অনুভব, চেতনা, কৌশল ও দক্ষতায় সৃষ্টি হয়। এর ফলে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তুর বিস্তৃতি প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্যের। এই বস্তু লোক কারুশিল্পের উপস্থিতি লোক জীবনধারার প্রতিটি ক্ষেত্রে, স্তরে। লোকজউৎসব, মেলায় লোকজীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বস্তজাতসংস্কৃতির বস্তু-লোক কারুশিল্পের লেনদেন, কেনাবেচার আয়োজন উৎসবও মেলার মতই একটি দীর্ঘস্থায়ী লোকজ প্রথা, সংস্কার। এজন্যই লোকজউৎসব, মেলায় বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-লোককারুশিল্পের সামগ্রীর পসরা, কেনাবেচা, লেনদেন একটি প্রথা। এবং এটা লোকজ উৎসব, মেলার প্রধান আকর্ষণ। লোক কারুশিল্পের শিল্পী, কারিগরের সঙ্গে ক্রেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সম্মিলনের কেন্দ্রস্থল লোকজ উৎসব, মেলা মোট কথা লোকজীবনের (Folk life) সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের লোকজীবন এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও সীমারেখায় সৃষ্ট কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। লোকজীবন ধারার এই প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশের লোকসংস্কৃতি, বস্তুজাতসংস্কৃতির গড়ন, রূপ নির্ধারিত হয়েছে। গ্রামীণ কৃষিজীবন ভিত্তিক, লোকজীবনধারার প্রয়োজনীয় বস্তুজাতসংস্কৃতির লোকওকারুশিল্প এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান, কাঁচামাল, উপকরণে তৈরি। লোকজীবন ধারায় মানুষের জন্ম থেকে মুত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু- বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোকও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। এর শ্রেণীকরণ এ ভাবে হতে পারেঃ

১. কৃষি কাজের সরঞ্জামঃ লাঙ্গল, বাঁশের ঝুড়ি, ধানের গোলা, ধান চাল মাপার বাঁশের, বেতের কাঠা, বাঁশের, বেতের মাথাল, ঢেকি, কুলা, বাঁশের খালই, ধামা।

২. গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসঃ মাটির হাঁড়ি,পাতিল, কলসি, শানকি, বাটি, গামলা, চারি, কাঠের চামচ, নারকেলের মালার চামচ, তালপাতার ও বাঁশের-বেতের পাখা, বাঁশের ঝুড়ি, কাঠের বাক্স, পাটের সিকা, শীতলপাটি, হোগলা, মাদুর, শতরঞ্জী, প্রদীপদানী।

৩. বাসস্থানের জন্য ঃ মাটির, বাঁশের, বাঁশ-ছনের ঘর। বাঁশের বেড়া, বেলকি, দরমা, কাঠের দরজা, জানালা, চৌকাঠ।

৪. বস্ত্র পরিচ্ছদ ঃ সুতিবস্ত্র, শাড়ী, লুঙ্গী, ধুতি, নকশী কাঁথা, গামছা, ফতুয়া। এবং উপজাতি, ও আদিবাসীদের পোশাক, পরিচ্ছদ।

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনেঃ নৌকা, গরুর গাড়ী, পাল্কী।

৬. মানুষের সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্তঃ বাঁশের বাশী, ঢোল, কারুকার্যময় কাঠের, বাঁশের জিনিস, একতারা, দোতরা, বাদ্যযন্ত্র।

৭. শশুদের আনন্দ বিধানঃ মাটির পুতুল, বাঁশের, কাঠের খেলনা, হাতী, ঘোড়া, পুতুল,গরুর গাড়ী।

৮. ধর্মীয়, লোকজ বিশ্বাসঃ মাটির কাঠের তৈরি প্রতিমা, মূর্তি, কাঠের মূর্তি, মাটির তৈরি লক্ষ্মীসরা। পাটি-জায়নামাজ, নকশীকাঁথা জায়নামাজ, কোরানের গিলাফ, পটচিত্র।

৯. **সাধারণ আসবাব** ঃ জলচৌকি, কাঠের পিড়ি, কাঠের বাক্স, কাঠের তাক, বাঁশের, বেতের বাক্স, ঝুড়ি।

১০. অঙ্গের সাজ সজ্জা ঃ লোক অলংকার, পুতির মালা।

লোক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোককারুশিল্প মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। এবং বস্তুজাতসংস্কৃতির এই বিস্তৃত ভান্ডারের আদান-প্রদান ও প্রসারের ক্ষেত্র লোকজউৎসব, মেলা। বছর ঘুরে এক একটি লোকজ উৎসব, মেলা এক একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক বস্তুজাত সংস্কৃতির নিদর্শন লোককারুশিল্পের উৎপাদন, সৃষ্টির ধারাকে করেছে বেগবান। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এভাবেই উৎসব, মেলা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি, পৃষ্ঠপোষকতার পরিবেশ সৃষ্টিতেও উৎসব, মেলা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশের লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লোকজউৎসব, মেলা এদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতি-লোক কারুশিল্পের কেন্দ্র। এই ঐতিহ্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অর্থাৎ হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতি লোক কারুশিল্পের বিক্রয় ও প্রসারের কেন্দ্র লোকজ উৎসব, মেলা। লোকজ উৎসব ও মেলা যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক উপাদান এবং সেই সংগে একধরনের সাংস্কৃতিক অবস্থাও বটে। বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোককারুশিল্প আমাদের দেশের লোকজীবনধারা- সংস্কৃতির অবকাঠামো সৃষ্টির কাজটি করে থাকে। সেই সঙ্গে লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির বাকজাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান-সংস্কৃতির উপরিকাঠামোকেও যুগপৎ ধারণ করে। জাতীয়সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বস্তুজাতসংস্কৃতির-বস্তু লোককারুশিল্পের মূল্য, গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ বস্তুজাতসংস্কৃতি লোককারুশিল্প লোকসমাজের মানুষের লোকজীবনধারা-লোক সংস্কৃতিকে ধারণ করে। এজন্য বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, লোককারুশিল্প জাতিতাত্ত্বিক। এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রথমে বস্তুজাতসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত বস্তু লোককারুশিল্পের অসংখ্য নমুনার দলিলীকরণ করা অপরিহার্য। আঞ্চলিক-স্থানিক, ও কালিক ব্যবধানে বহু বিচিত্র ধরনের অসংখ্য বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোককারুশিল্প ক্রমাগত সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে চলমান, অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যের লোক জীবনধারায় আজ অবধি ক্রমপুঞ্জিত ভাবে রূপান্তরিত ধারাবাহিক রূপকে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু, লোককারুশিল্প ধারণ করে সচল, অব্যাহত রয়েছে।

লোকজউৎসব ও মেলায় বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোককারুশিল্পের উল্লিখিত লোকজীবনধারাকেন্দ্রিক দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু বিচিত্র জিনিস কেনা বেচা, লেনদেন হয়ে থাকে। এই নিয়ম ও ধারাটিও আমাদের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রথা, রেওয়াজ, এবং সংস্কার। আবহমানকাল থেকে আজ অবধি আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় সকল উৎসব, মেলায় এক এবং অভিন্ন ঐতিহ্য অনুসৃত হচেছ। এবং লোকজউৎসব, মেলা আমাদের লোকসমাজের লোকজীবনধারার সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোককারুশিল্পের প্রদর্শন, প্রসার বাজারের আদর্শ কেন্দ্র। বাংলাদেশের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটি এখনো এদেশের গ্রামের মানুষের অনুভব চেতনায়, জীবনযাপনে সক্রিয়। ফলে লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির তাগিদ, প্রথা, নিয়ম, রেওয়াজ লোকজউৎসব মেলাকে একটি সংস্কার হিসেবে আবহমানকাল থেকে আজ অবধি আয়োজন করা হয়। লোকজউৎসব,মেলার এই আয়োজন ঐতিহ্যিক ধারার পাশাপাশি স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে নবনব রূপে লোকজ উৎসব, মেলা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে রূপলাভ করে চলেছে।

বস্তুজাতসংস্কৃতির দলিলীকরণ ও লোকমেলা

যেহেতু বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্প আমাদের গ্রামীণ লোকসমাজের মানুষের লোকজীবনধারা লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির স্বভাব-আচরণ, জীবনধারা বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনে আরোপিত, স্থিত, নির্ধারিত, সেহেতু বাংলাদেশের লোকমেলাগুলোতে কারুশিল্পীদের বিক্রির জন্য নিয়ে আসা বস্তুজাত সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের গড়ন, ব্যবহার, রংরূপ বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক মেলায় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় বস্তু জাত সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্প আকর্ষণের বিষয়। এর অনুপুংখ দলিলীকরণ হলে বস্তুজাতসংস্কৃতি লোক ও কারুশিল্পের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, তারতম্য, পার্থক্য সনাক্তকরা সম্ভব হবে। মূলতঃ লোকমেলার সংগে বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের সম্পৃক্ততা মেলার সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লোকমেলার এই ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। এ জন্য যে কোন ধরনের মেলার সংগে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

বস্তুজাতসংস্কৃতি, লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

মেলা যেমন ধর্মীয়, লোকজ আচার উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তেমনি জাতীয় উদ্দীপনা, উজ্জীবনে, মর্যাদার জন্যও, যেমন স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন সংযোজন। এধরনের মেলা এ দেশের মেলার ঐতিহ্যের উপাদানগুলোকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এবং মেলার ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে গত ১৯৮০ সাল থেকে অনুরূপ লোকমেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ফাউন্ডেশন একদিনের, পরে দুই ও তিনদিনের বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। এই পর্যায়ে ১৯৯১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । ১৯৯২ সালে এই মেলা সাত দিনের মেলায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ থেকে ফাউন্ডেশন শীতকালে দেশে দীর্ঘতম একাটানা একমাসের লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করছে । ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ক্রমশ দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত মেলায় পরিণত হতে চলেছে।

ফাউন্ডেশনের লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব দেশের লোকজীবনধারা-লোক সংস্কৃতির ধারার মত একটি তাগিদ , প্রথা, নিয়ম রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে। লোক ঐতিহ্যের সংস্কারের অনুসরণে এই লোকমেলার আয়োজন হচ্ছে প্রতিবছর । প্রতিবছর

এই মেলার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সোনারগাঁয়ের আশে পাশের থানা ও জেলার সাধারণ মানুষ এবং মহানগরী ঢাকার নাগরিক । এ ছাড়া সারা দেশের লোকসংগীত শিল্পী ও কারুশিল্পীগণ, পুরো বৈশিষ্ট্যই লোকমেলার।

ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক ও কারুশিল্প মেলা লোকজউৎসব বাংলাদেশের অন্যান্য লোকমেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ক্রমশঃ মেলার রূপ পরিগ্রহ করছে। সংস্কৃতির মতই প্রবহমান ধারায় এই পথ চলা। লোকজীবনধারা-লোক সংস্কৃতির তাগিদ, প্রথা, নিয়ম, রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে এই মেলা। লোকমেলার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই মেলায় স্বাভাবিক নিয়মে এদেশের লোকজীবনধারা, ঐতিহ্যের নিরিখে বস্তুজাতসংস্কৃতির বস্তুলোক ও কারুশিল্পের পসরা সাজে। আমাদের গ্রামবাংলার লোকজীবনধারার প্রতিদিনের প্রয়োজনের বস্তু লোক ও কারুশিল্প এই মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। এ সব বস্তু-লোক ও কারুশিল্প লোক ঐতিহ্যের ধারায় প্রয়োজনের, উপযোগিতার এবং সৌন্দর্যের।

তথ্যনির্দেশ

১. Felix M. Keesing, Cultural Anthropology, 1965: 197.

২. **Morris Desmond 1962 the Biology of Art : A Study in the picture making behaviour of the great Apes and its relationship to Human Art, New york; Alfred Knopf**

৩. Boas, Frainz, Primitive Art, New york: Dover Publications. (1927)

৪. Lowie, R. H. 1940, An Introduction to Cultural Anthropology New york: Holt, Rinehart and Winstorn.

৫. Jan Harold Brunvand, The Study of American Folk lore 1969: 198.

লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণে উন্মুক্ত যাদুঘর

বাংলাদেশ ও আধুনিক যাদুঘর

যাদুঘরের একটি সাধারণ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক সচেতনতার বস্তুজাতরূপের সংরক্ষণ ও বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে এর ব্যাখ্যার জন্য প্রদর্শনের আয়োজন করা। এর মূলে রয়েছে মানুষের অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু মনোভাব এবং কোন কিছু অর্জনের প্রবণতা।

ইউরোপের দেশসমূহের যাদুঘর প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতার আলোকে এশিয়া ও আফ্রিকায় যাদুঘর প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল। ভারতে দেশীয় বিদ্যোৎসাহী উচ্চবিত্তের শিক্ষিত অনুসন্ধিৎসু সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সংগৃহীত সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি দিয়ে কোলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। এদিকে ঢাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের উৎসাহে, পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা যাদুঘর ১৯১৩ সালে এবং রাজশাহীতে স্থানীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে। এসব যাদুঘর ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরের অনুসৃত ধারায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। এসব যাদুঘরের প্রধান আকর্ষণই ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, প্রাচীন শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এ ছাড়া অপ্রধান শিল্পকলা-ডেকোরেটিফ আর্টের নিদর্শনসমূহের প্রদর্শন। এসব যাদুঘরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইউরোপের যাদুঘরের ন্যায় বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি করা, শিক্ষার প্রত্যক্ষ উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশের মানের উত্তরণের উপায় হিসেবে এবং নাগরিকের গৌরব বা জাতীয় চেতনার বিকাশে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ এবং লোকশিল্পের ঐতিহ্য

শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব ইউরোপে ঐতিহ্যগত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের লোক ও কারুশিল্পের দ্রুত মর্যাদাহানী, অধোপতনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে শিল্পোন্নত দেশগুলোর আবহমান সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য-লোকসংস্কৃতি তখন থেকে নানা পর্যায়ে হুমকি, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর অন্যতম

কারণ ছিল দ্রুত আধুনিকতার বিস্তার। ফলে শিল্পায়ন, নগরায়নে ইউরোপে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসংগে ইউরোপের দেশগুলোতে জনজীবনে নানা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্যণীয়, যেমন সাধারণ মানুষ যারা বহুপুরুষ ধরে একই স্থানে-গ্রামে বা গ্রামের একই অঞ্চলে বসবাস করে আসছিল তারা তাদের আবাসস্থান, অঞ্চল, গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র শহরে বসবাসের জন্য চলে যেতে শুরু করল। তাদের পিতৃপুরুষের আবাসস্থল ত্যাগের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য থেকে তাদের দূরত্ব বেড়ে গেল। ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাওয়ার পরিবেশে পতিত হল। গ্রাম থেকে তাদের স্থান হলো শহরে ও নগরে। নগর তাদের ঐতিহ্যের পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ইউরোপে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্মুক্ত যাদুঘর প্রসংগ

এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই ইউরোপের ফোকলোরিষ্ট, জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি, লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্প সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে যতদূর সম্ভব নিদর্শন সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, এবং লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির প্রকাশ হিসেবে ইউরোপে সর্বপ্রথম ওপেন এয়ার মিউজিয়াম বা উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে লোকসংস্কৃতি যাদুঘর শুরু হয়। মূলতঃ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগকারী ইউরোপের দেশগুলোতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই লোকসংস্কৃতি প্রীতির সূচনা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। ইউরোপে সে সময়ে তাদের লোকসমাজ, গ্রাম, গ্রামের বৈশিষ্ট্য, গ্রামের শিল্পকলা, গ্রামের মানুষের জীবনধারা দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের ধারায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শিল্পসমাজ শিল্পনগরী, বণিক সমাজ বণিক নগরীর দিকে রূপান্তরিত হচ্ছিল। অথচ একই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশসমূহের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্টের ঐতিহ্যের অমলিন, অকৃত্রিম ধারা লোকশিল্প, কারুশিল্প, ট্রাডিশনাল জীবনধারা, গ্রামীণ স্থাপত্য সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে অব্যাহত ছিল। এই অবস্থা ইউরোপের ফোকলোরিষ্ট ও জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতেই ইউরোপে জাতিতত্ত্ব ধারার যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটে সাধারণ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রচলিত সাধারণ যাদুঘরের পাশাপাশি জাতিতত্ত্ব পর্যায়ের কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের ও বৈশিষ্ট্যের উন্মুক্ত যাদুঘর (Open-Air-Museum) লোকঐতিহ্যযাদুঘর, লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা ইউরোপে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এ সময় ইউরোপে যারা উল্লিখিত ধরনের উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিল তারা গ্রামের মানুষের জীবনধারার সকল লুপ্তপ্রায় অবশিষ্ট উপাদান, উপকরণগুলোকে এবং

এমন কি গ্রামীণ জীবনের অবিকল অমলিন প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবেশের চিত্রসমূহ সংগ্রহ, জোগাড় করেছিল। শিল্পবিপ্লবপূর্বকালের ইউরোপের গ্রামীণ লোকজ মানুষের সংস্কৃতির-লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন, এই লক্ষ্যেই উত্তরপুরুষ, প্রজন্মের জন্য এহেন সংরক্ষণ।

ইউরোপে ঐতিহাসিক নিদর্শনের যাদুঘর এবং সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক যাদুঘর

সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাসকেন্দ্রিক যাদুঘরগুলো একটি দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাসের ধারাকে, ইতিহাসের কালসমূহকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন, প্রদর্শনের জন্য কার্যক্রম চালায়। কিন্তু যেসব যাদুঘর জাতিতত্ত্বযাদুঘর, উন্মুক্ত যাদুঘর বলে পরিচিত, ইউরোপে সেসব যাদুঘর কোন দেশের বা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক যাদুঘর হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশসমূহ এ ধরণের যাদুঘরগুলোকে সাংস্কৃতিক যাদুঘর বলেই অভিহিত করে। স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোতে এই সাংস্কৃতিক যাদুঘর- জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর পুরানো ধারায় অর্থাৎ যাদুঘর ভবনে প্রচলিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা অথবা উন্মুক্ত যাদুঘর পদ্ধতির প্রদর্শন ব্যবস্থা উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করে এই ধারার সূচনা করে। অর্থাৎ স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোই উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এবং ইউরোপে এ ধরনের প্রথম উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশ নরওয়ের রাজধানী ওসলোর নিকটে বাইগডে। এ ছাড়া সুইডেনের ষ্টকহোমের স্কানসেন এবং প্যারিসে উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিল্পবিপ্লবপূর্বকালের ইউরোপের গ্রামীণ লোকসমাজের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক জীবনের অনুপুংখ বিষয়কে উন্মুক্ত পরিবেশে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনীর প্রয়াস নেয়া হয়। উন্মুক্ত পরিবেশকেন্দ্রিক যাদুঘরগুলো প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনধারায় গঠিত ইউরোপের শিল্পবিপ্লবপূর্ব গ্রামীণ লোকজীবনধারা-সাংস্কৃতিকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রাকৃতিকপরিবেশ- প্রাকৃতিকপরিবেশ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক উপাদান-লোক কারুশিল্প অর্থাৎ ইউরোপের গ্রামীণ মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে এই চেতনা, বোধকে জাগ্রত করতে এবং ঐতিহ্যের প্রতিশ্রদ্ধা সৃষ্টিতে এই উন্মুক্ত যাদুঘরগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

এশিয়া, আফ্রিকা, ও ল্যাটিন আমেরিকায় ইউরোপের উপনিবেশগুলোর লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ঔপনিবেশিক শাসকদেশসমূহ তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলোর সংস্কৃতিকে দেশীয়, আঞ্চলিক, ভার্নাকুলার কালচার, উপজাতীয় সংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি এসব নামে অভিহিত করতে চাইলেও তারা উপনিবেশগুলোর লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে

তাদের নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সচেতন ছিলেন। এবং এই প্রেক্ষিতে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী, জাতিতত্ত্ব গবেষকগণ এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য, তত্ত্ব সংগ্রহ সর্বপরি লোকসংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শনাদি সংগ্রহ করে নিজ দেশে প্রেরণ করে। ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য রাখা উপনিবেশসমূহের সাংস্কৃতিক নিদর্শন তার প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কিত আরো তথ্য প্রমাণ মেলে যে, ব্রিটেনে ১৮৫১, প্যারিসে ১৮৬৭, এবং ১৮৭৮ সালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের উপনিবেশসমূহের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্পের, লোকজীবনের উপকরণের বিশ্বমেলার আয়োজন করে। এসব প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর সাধারণ লোক সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন দিয়েই ব্রিটেনে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম ও ফ্রান্সের মিউজিয়ামগুলো সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ করে ১৮৬৭ সালে প্যারিসে আয়োজিত বিশ্বপ্রদর্শনী আয়োজনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক নিদর্শন প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর সাংস্কৃতিক চরিত্রকে তুলে ধরা। এই প্রেক্ষিতে ইউরোপে বহু জাতিতত্ত্ব যাদুঘর স্থাপিত হয়। ইউরোপের জাতিতত্ত্ব যাদুঘরগুলোতে তাদের নিজদেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারা-লোকজীবনের-লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশের লোকসাংস্কৃতিকঐতিহ্য ও উপজাতীয়-আদিবাসী সংস্কৃতির উপাদানসমূহের সংগ্রহ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। মূলতঃ উন্মুক্তযাদুঘর পদ্ধতিতে প্রদর্শন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্পকে জনগণের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিকঐতিহ্য বলে অভিহিত করল। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে জনগণের সংস্কৃতি, শিল্পকলা-লোকসংস্কৃতিরযাদুঘর, জাতিতত্ত্বযাদুঘর, পরিবেশ যাদুঘর, গ্রামীণযাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিত্তিতে এসব জাতিতত্ত্ব যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

ইউরোপে উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় বৈচিত্র

একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে ঐতিহ্যের গ্রাম, গ্রামের শিল্পকলা, লোকশিল্প এবং কারুশিল্পের অবলুপ্তি, অবনতি অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের শক্তিশালী লোকজঐতিহ্য, জাতীয়ঐতিহ্য, লোক ও কারুশিল্পের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র ও ঐতিহ্য ইউরোপকে জাতিতত্ত্ব এই ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন শ্রেণীর অপ্রচলিত ধারার ওপেন এয়ার মিউজিয়াম অর্থাৎ গ্রামীণজীবন ও পরিবেশকেন্দ্রিক উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এভাবেই ইউরোপে গ্রামীণ লোকশিল্প, কারুশিল্পের ধারার ক্রমপ্রবাহকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলল। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ইউরোপে একশ বছরের বেশী পূর্বেই জাতিতত্ত্বযাদুঘর স্থাপন শুরু হয়েছিল। জাতিতত্ত্বযাদুঘর স্থাপন করতে গিয়ে নানাবৈশিষ্ট্যকে উন্মোচন, নানাধারার প্রকাশ বা মাইক্রো চিন্তাচেতনার ফসল হিসেবে ইউরোপে বিশ্বের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের এবং ইউরোপের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জাতিতত্ত্ব যাদুঘর প্রতিষ্ঠার এক পর্যায়ে বৈচিত্র আনতে এ ধারায় যেসব নতুন নামের যাদুঘর সৃষ্টি হল তা হচ্ছে, লোকযাদুঘর, ফোকলোর যাদুঘর, গ্রামীণ যাদুঘর, গ্রামীণজীবন যাদুঘর, লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প, হস্তশিল্প যাদুঘর। এসব যাদুঘরের একটা অভিন্ন লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ ধরনের যাদুঘরগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিঅঞ্চল ও জাতিভিত্তিক লোকজজীবনকে নিয়ে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের কাজে নিয়োজিত হয়।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উন্মুক্তযাদুঘর

তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিল কেবল তখনই এসব মহাদেশের সদ্য স্বাধীন দেশসমূহে সত্যিকার অর্থে পূর্ণভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সাংস্কৃতিকঐতিহ্যের যাদুঘর, বিশেষ করে জাতিতত্ত্বযাদুঘর, উন্মুক্তযাদুঘর, লোকযাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন হিসেবে এবং সাংস্কৃতিক অধিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ দেশের, জাতির, সমাজের সাংস্কৃতিক সচেতনতা রূপলাভ করে, বিকশিত হয়, স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার, মুক্তির প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ নিশ্চিত করে।

এভাবেই ইউরোপ থেকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশসমূহে জাতির জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর উন্মুক্তযাদুঘর, লোক সংস্কৃতি এবং লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর স্থাপিত হলো। পৃষ্ঠপোষক হলো জনগণ, জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার। জনগণের সাংস্কৃতিক মুক্তি, আকাংখা এবং অধিকারের প্রতিফলন ঘটল এসব জাতিবিষয়ক লোক যাদুঘর, উন্মুক্তযাদুঘর প্রতিষ্ঠায়। যেমন আফ্রিকার নাইজারের জাতীয়যাদুঘর। এই যাদুঘরটি জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর পরিবেশ, প্রতিবেশকেন্দ্রিক উন্মুক্ত লোকযাদুঘর। এই উন্মুক্ত যাদুঘরে নাইজারের বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনধারায় গঠিত সাংস্কৃতিকপরিবেশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন কি সাধারণ মানুষের জীবনধারার

অনুষঙ্গ ও উপযোগিতার জন্য তৈরি সৌন্দর্য্যের বস্তু, লোক ও কারুশিল্পের তৈরি, কৌশল ও দক্ষতাকে কর্মরত কারুশিল্পী দিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রসংগ

১৯৭১ এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক মুক্তি, এই চেতনা সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে। জাতীয় জীবনে এই চেতনা জাগ্রত ও সক্রিয় হয়েছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। বজায় রেখেছে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত ও প্রবহমান রাখতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে কাজে লাগানোর জন্য এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ একটি তাগিদে পরিণত হয়। স্বাভাবিক তাগিদের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পরিবেশকে বেগবান করার লক্ষ্যে জাতীয়সংস্কৃতির রূপবৈচিত্রকে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ক্রমপুঞ্জিত ধারায় সুষম, প্রবহমান ও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জাতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে বলীয়ান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের অনুভবে, চেতনায় এদেশের সংস্কৃতির মূলচালিকাশক্তি আবহমান বাংলার লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকে। এবং জনগণের সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক মুক্তির চেতনার বহিপ্রকাশ হিসেবে এদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতির শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি অঙ্গীকারে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতি

জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে, প্রতিষ্ঠায় ও বিকাশে এদেশের মোট আয়তনের আশিভাগ জুড়ে যে গ্রামাঞ্চল রয়েছে, সেই গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি, লোকজীবন ধারায় গড়ে ওঠা আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারার বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও সম্ভাবনার উজ্জীবনের বিষয়টি জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। জাতিসত্ত্বাকে সুদৃঢ় করতে, স্বাধীনতাকে অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ করতে, বিশ্বে বাংলাদেশের জাতীয়সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে, বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সংগ্রহ সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, এবং বিস্তারিত কার্যকরী কর্মসূচী,

পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মূলতঃ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয় যে, যেহেতু আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান দেশ, মাটি, প্রকৃতি, মাতৃভাষা বাংলা, লোকসংগীত, লোকসাহিত্য ও লোক ও কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে, মুক্তি সংগ্রামে, স্বাধিকারের সংগ্রামে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে অবলম্বন, প্রেরণা, শক্তি, আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল এবং সমস্ত জাতিকে একতাবদ্ধ করেছিল, সেহেতু লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারার শক্তি এদেশের সাধারণ মানুষের চিন্তার ও মত প্রকাশের এবং সৃষ্টির স্বাধীনতার অনুকুল পরিবেশ নির্মাণে হাতিয়ার, পাথেয় এবং মূল উপাদান।

বাঙ্গালীর হাজার বছরের বৈশিষ্ট্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এদেশের আবহমান বাংলার লোকজীবনের ও লোকসমাজের সাধারণ মানুষের জীবনধারা-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহ কালের ব্যবধানে সাংস্কৃতিক সাংগীকরণ ও পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ এই ভৌগলিক অঞ্চলটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিঅঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এই সংস্কৃতিঅঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবজায় রাখতে ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে লোকজীবনধারার সাধারণমানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ এ মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে হাজারবছরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতিঅঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণমানুষের 'জীবনধারা'-গ্রামীণ লোকসমাজের লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির বিজয় হয়েছে। এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের জীবনধারা-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিকউপাদান, বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্রময় প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, এদেশের মানুষের সৃষ্টি সাংস্কৃতিকপরিবেশের অন্তর্ভূক্ত সাংস্কৃতিকউপাদান ধর্ম, আচারঅনুষ্ঠান, বাংলাভাষা, লোককারুশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকস্থাপত্য বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এবং বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীকারের সংগ্রাম, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর বলে সনাক্ত হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রবহমানধারা বাংলাদেশের জাতীয়সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং নির্মাণের কাজ অব্যাহতভাবে করছে। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন সাংস্কৃতিক অধিকার

চেতনা, এর মূল্যায়ন, ওপর দিকে নগরায়ন ও আধুনিক জীবনধারা ও কনজুমার সমাজের প্রভাবে গ্রামীণ লোকঐতিহ্যের-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের অবলুপ্তির অবস্থা রোধ করতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণে নানা পদক্ষেপ নেয়ার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলে।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য লোকারুশিল্পের সংরক্ষণ এবং সোনারগাঁয়ে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

এমন প্রেক্ষাপটে, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য-লোকসংস্কৃতিকে জাতীয়জীবনে মর্যাদা প্রদান, এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নে কর্মসূচী হাতে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান, এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনধারার প্রয়োজনের, সৃষ্টির লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারাকে জাতীয় জীবনে নতুন প্রজন্ম এবং বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ইতিহাসখ্যাত সোনারগাঁয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। সোনারগাঁও একদিকে ত্রয়োদশ ও চতুদর্শ শতকের স্বাধীন বাংলার রাজধানী, অপরদিকে বাংলার লোক কারুশিল্পের ঐতিহ্য-প্রাচ্যের গৌরব মসলিন ও জামদানী বস্ত্র খ্যাত। কালের ব্যবধানে ইতিহাসের নানা পথ পরিক্রমায় এখনকার অজপাড়াগাঁওয়ে পরিণত স্মৃতির সোনারগাঁওকে বাংলাদেশের ইতিহাসের ও সংস্কৃতির সুবর্ণ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন স্থাপনের কেন্দ্র হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছিল। শিল্পাচার্য জয়নুলের শৈল্পিক অনুভব ও চেতনায় যে রূপকল্প নির্মিত হয়েছিল তারই ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের একটি প্রাথমিক রুপরেখা নির্মিত হয়েছিল। এবং শিল্পাচার্যের রূপকল্পে সনাক্ত হয়েছিল সোনারগাঁও, সোনারগাঁওয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র, এখানকার কারুশিল্পের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট, দেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের গ্রামের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের জীবনধারা লোকসমাজের লোকশিল্পী-কারিগরদের শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনার প্রকাশ তাদের সৃষ্টি লোককারুশিল্পের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মূল্যের মর্যাদাকে জাতীয় জীবনে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশে আধুনিক শিল্পচর্চার ধারাকে আবহমান বাংলার লোক কারুশিল্পের ঐতিহ্যের শিকড়ের সংগে সম্পৃক্ত করতে এবং বর্তমান প্রজন্মের

মধ্যে লোক ও কারুশিল্পের প্রবহমান ধারাকে সক্রিয় ও অব্যাহত রাখতেই সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতিবিজড়িত সোনারগাঁও, এই প্রেক্ষাপটেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের সাধারণ মানুষের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক উপাদান অর্থাৎ গ্রামীণ লোকজীবনধারার অপরিহার্য অঙ্গ লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে ফাউন্ডেশন সোনারগাঁয়ে ১৯৭৬ সালে লোক শিল্প যাদুঘর" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৬ কাজ শুরু হয়।

১৯৮০ সালে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" প্রস্তাব অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ শুরুর মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বিশ্বের যাদুঘরতত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতিতাত্ত্বিক ধারায় উন্মুক্ত যাদুঘর পদ্ধতির কার্যক্রমের সূচনা করে। জাতিতত্ত্ব ধারায় উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আবহমান বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের লোকজীবনধারায় গড়ে ওঠা লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে একটি পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলয় নির্মাণের জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য উন্মুক্ত যাদঘর পদ্ধতির কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সোনারগাঁয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কল্পনা অনুযায়ী পুরনো ভবন সরদার বাড়ি কেন্দ্রিক ১৫০ বিঘা আয়তনের ভূমিকে নির্দৃষ্ট করা হয়। উক্ত ১৫০ বিঘা ভূমির বেশীরভাগ প্রাকৃতিক খাল, নীচু ডোবা, পুকুর, একফসলী নীচু নালজমি যার পরিমাণ প্রায় ৯০ বিঘা। মাত্র ৬০ বিঘা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, যেন পানিতে ভেসে আছে উচু ভিটি বাড়ি, উঠান এবং ছোট ফলের বাগান। এই স্বল্প পরিমাণ উঁচু ভিটি বাড়ী জমিও তৈরি হয়েছে পুকুর কেটে বা খাল থেকে শীত মৌসুমে মাটি সংগ্রহ করে। তার প্রমাণ এখানকার প্রতিটি ভিটিবাড়ির সামনে ও পেছনে পুকুর ও খালের অবস্থান। এখানকার ভূমির বৈশিষ্ট এমন যেন নীচু জলাভূমির উপর ভিটিবাড়ি সবুজ গাছ-গাছালিসহ মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি ভিটি বাড়ির সঙ্গে অপরটির ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে প্রাকৃতিক খাল, জলা, নীচু জমি। বর্ষায় নৌকায় যোগাযোগ এবং শীতে দুই ভিটির মাঝের নীচুজমি, বা খাল যদি শুকিয়ে যায় তা হলে হেঁটে

যাওয়া যায়। এই ছিল উক্ত ১৫০ বিঘা আয়তনের ভূমির বৈশিষ্ট, বৈচিত্র যেন প্রতিটি ভিটি বর্ষায় একটি দ্বীপ এবং শীতকালে নীচু জমির উপর উচুভূমির ভিটিবাড়ি, উঠান, ও বাগান। ভূমির এই বৈশিষ্ট্য সোনার গাঁয়ের বৈশিষ্ট্য। ফলে এখানে উদ্ভিদ জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র অন্য অঞ্চল থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদ্ভিদ জগতের সবুজের সমারহ সারা বছরেই প্রায় সজীব থাকে, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এই সজীবতা বহুগুণ বেড়ে যায়। ভূদৃশ্যে পানি ও বৃক্ষের ও লতাপাতার সবুজের সমাহার এবং এরই মাঝে দ্বীপের মত ঘরবাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। এমন প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের বৈশিষ্ট্যের সরদার বাড়িকেন্দ্রিক ১৫০ বিঘা ভূমির বৈচিত্রময় সীমারেখা ও রূপের উপর ভিত্তি করে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসুচীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৯৮৬ সালে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। সেই অনুযায়ী মাস্টার প্লানের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শিল্পাচার্যের শৈল্পিক অনুভব ও চেতনার রূপকল্পে সনাক্তকৃত চিত্রকল্প সোনারগাঁওয়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ১৫০ বিঘা আয়তনের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার স্থানকে উন্মুক্ত যাদুঘর নির্মাণের জন্য একটি স্থানিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলয় গড়ার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য ঐ নির্দৃষ্ট আয়তনের স্থানে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যময় ভূপ্রকৃতি নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি সাধারণ রূপকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে স্থাপত্যিক নকশায় পরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। "লোকও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসুচী বাস্তবায়ন প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে ১৫০ বিঘা আয়তনের বৈশিষ্ট্যসূচক স্থানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিত্র সম্বলিত নদ-নদী খাল,পুকুর ডোবা, সবুজ গাছপালা, লতা পাতা গুল্ম ঘরবাড়ী মানুষ-কারুশিল্পী, দর্শনার্থীর কোলাহল সহ ভূদৃশ্যের দিগন্ত সৃষ্টিতে সমস্ত ভূমিতে পরিবেশের একক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে স্থানিক অবিচ্ছিন্ন রূপ (Continuity) নির্মাণের লক্ষ্যে একটি বাস্তবায়নপূর্ব স্থাপত্যিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। এবং ঐ স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত উল্লিখিত ১৫০ বিঘা আয়তনের ভূমিকে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশের সমতলভূমি ও জলাভূমি ও প্রকৃতির সাধারণ চরিত্র, বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কৃত্রিম আকাবাকা জলাশয়-খাল নির্মাণ করা হয়। এতে নকশাপূর্ব ভূমির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং নকশা অনুযায়ী নির্মিত কৃত্রিম আকাবাকা জলাশয় খালের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নতুন ভূমি বৈশিষ্ট্য, সেই মোতাবেক গাছপালা সম্বলিত প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। এবং প্রাথমিক পর্যায়ের এই কর্মসূচীতে ১৫০ বিঘা ভূমি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাধারণ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কৃত্রিম প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এমন ভূদৃশ্যের স্থানে লোক কারুশিল্প যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুলকারুশিল্প

যাদুঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। এছাড়া বার্ষিক লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের জন্য লোকমঞ্চ, আকাবাকা খালে বিভক্ত উচু ভূমির অংশগুলোকে সংযোগের সৌন্দর্য দান করেছে কাঠের ও বাঁশের বাকা সেতু। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৫ সালে ফাউণ্ডেশনের মাস্টার প্লানটির সামান্য সংশোধন করে সংশোধিত মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। পরে "লোক কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম- ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ"—"রূপসী বাংলাদেশ" কর্মসূচীর পরবর্তী পর্যায় "কারুশিল্পগ্রাম" স্থাপন প্রয়োজন হবে।

কারুশিল্পগ্রামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক গ্রামীণ ঘরবাড়ীর নমুনা প্রতিস্থাপন করা হবে বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবহেলিত অথচ দক্ষ কারুশিল্পীগণ নির্দৃষ্ট সময়ের কর্মসূচীর অধীনে কারুশিল্পগ্রামে কর্মরত কারুশিল্পীগণ প্রদর্শনীতে তাদের দক্ষতা, কৌশল, অংলকরণ গড়ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। এছাড়াও স্থাপন করা হবে লোকশিল্পের নিদর্শনসমূহের পৃথক পৃথক যাদুঘর যেমন পুতুল যাদুঘর, হাড়ি পাতিল যাদুঘর, বাঁশবেতের যাদুঘর, পাটি যাদুঘর এবং লোকমঞ্চ ইত্যাদি।

জাতিতত্ত্ব যাদুঘর ধারার "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" - "রূপসী বাংলাদেশ" উন্মুক্ত যাদুঘরে বাংলার গ্রামীণ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রস্তাবিত কারুশিল্পগ্রামের পাশাপাশি শিল্পাচার্য জয়নুল লোকও কারুশিল্প যাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোক ও কারুশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্থানিক রূপকে ধারণ করবে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের এই "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ"-"রূপসী বাংলাদেশ" পরিবেশ স্থাপনে অবকাঠামো নির্মাণে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত উন্মুক্ত যাদুঘর বা (Open-Air-Museum) পদ্ধতির প্রদর্শন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে দর্শকদের প্রায়ই উপলব্ধি হয় যে ফাউন্ডেশনের "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ"- "রূপসী বাংলাদেশ" এই স্থানিক আয়োজন কেবল দেশের অগণিত গ্রামের সাধারণ মানুষকে, মানুষের শিল্পকলা লোক ও কারুশিল্প নিয়ে নয় বরং তাদের জন্যও বটে।

কারুশিল্প গ্রাম

বাংলার লোকজীবন ধারা, লোকসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্প

আবহমান বাংলার জীবনধারায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি রূপলাভ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকার ও ধারক।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের আশিভাগ জুড়ে গ্রামাঞ্চল। আর এই গ্রামাঞ্চল এদেশের জনসংখ্যার আশিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের আবাস। অবশিষ্ট ২০ ভাগ নগর ও শহর বাসী। মূলতঃ বাংলার গ্রামের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রয়োজনে এদেশের বৈশিষ্ট্যময় প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় গ্রাম ও গ্রামীণ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এবং গ্রামীণ পরিবেশের বৈশিষ্ট্যময় লোকজীবন ধারায় বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির পথ পেয়েছে। ফলে বাংলার লোকজীবনধারার অন্তর্ভূক্ত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক পরিচয় রূপ লাভ করেছে। গ্রামীণ জীবনধারাভিত্তিক লৌকিক আচার-আচরণ, ধর্ম, উৎসব, লোক সাহিত্য, লোকসংগীত, নৃত্য এবং লোক ও কারুশিল্পের মত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এসব সাংস্কৃতিক উপাদান বাংলার লোকসংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীজীবনভিত্তিক কৃষিজীবন-লোকজীবনধারাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারায় বাংলার সাধারণ মানুষকে প্রতিদিনের জীবনে চলা ও পরিতৃপ্ত করার ঐতিহ্য এদেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য। লোকসংস্কৃতির পরিচয় লোক ও কারুশিল্পে, লোকসাহিত্যে ও লোকসংগীতে বিধৃত। আবহমান বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসীমায় এদেশের ঐতিহ্যের লোকসমাজ-কৃষকসমাজের গ্রামীণমানুষ তার প্রতিদিনের জীবনযাপনে, কর্মকান্ডে চারপাশের প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান, উপকরণ দিয়ে বৈচিত্রের, বৈশিষ্ট্যের রূপ ও গড়ন, বস্তু, লোকসংস্কৃতির বস্তুগত পরিচয় লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টি লোকজীবনধারায় সাধারণ উপযোগিতার নিরিখে

উদ্ভাবন ও রূপ পরিগ্রহ করলেও আবহমান বাংলার গ্রামের মানুষের অনুভব ও চেতনার গুণ যুক্ত হয়ে, অলংকৃত, বর্ণাঢ্য রূপময় সৃষ্টিতে পরিণত হয়। লোক ও কারুশিল্প ধারণ করেছে বাংলার লোক সংস্কৃতির কালিক ও স্থানিক রুপ বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে। এভাবেই বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প বিশ্বে বৈশিষ্ট্যের লোক ও কারুশিল্প হিসেবে রূপ লাভ করেছে। বলা যায় "আবহমান কাল ধরে লোক সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে যে চারু ও কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা-ই লোকশিল্প"।[১] (আলম ১৯৯১) বাংলাদেশের লোকশিল্পের শিল্পী ও কারিগর গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ। এরা প্রতিদিনের গ্রামীণ লোকজীবনে জীবনযাপনের তাগিদে কাজ করতে গিয়ে বা কাজের অবসরে লোকশিল্প সৃষ্টি করেছে। এই লোকশিল্প এদেশের সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural trait) ও অবস্থা (Cultural Complex)[২] (Encyclopaedia Britannica-১৯৮৬) হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন প্রসংগ

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমসমূহের প্রভূত উন্নয়ন সাধনের ফলে সারা বিশ্বে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। নগরায়নের গতিদ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। নগরকেন্দ্রিক জীবনধারা গড়ে উঠছে সর্বত্র। নগরজীবন-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটেছে। গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক লোকশিল্পের উপর প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। আধুনিক পণ্য বাজার লোকশিল্পের স্থান দখল করে নিচ্ছে। এভাবেই বিশ্বের সর্বত্র লোক ও কারুশিল্পের মূলধারা বিলুপ্ত হতে চলেছে। অনিবার্যভাবে লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টির পরিবেশ গ্রাম, গ্রামের লোকসমাজের লোকজীবনধারার প্রবহমানতা বাধাগ্রস্থ, প্রতিকুল অবস্থায় পতিত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোক ও কারুশিল্প বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারার প্রবহমানতার গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত, সক্রিয় এবং বেগবান করার জন্য ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বিশ্বের নানা দেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোক ও কারুশিল্প, লোকসংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব, লোকজীবন এবং উন্মুক্ত যাদুঘর। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ও বিলম্বে হলেও বাংলাদেশেও নগরায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ও গণমাধ্যমের উন্নতি সর্বপরি নগরসংস্কৃতি— কনজুমারসংস্কৃতির প্রভাববলয় থেকে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্প কোনক্রমেই মুক্ত নয়।

চলতি শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ অবধি এই অবস্থা বাংলাদেশের প্রাজ্ঞজনকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরু সদয় দত্ত, ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ, কবি জসিমউদ্দিন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং শিল্পী কামরুল হাসান। এরা তাদের ভাবনায়, চেতনায় ও লেখায় বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মূল রূপ, গঠন লোক সংস্কৃতি ও এর বস্তুজাত রূপ লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের অবলুপ্তি রোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা লোক ও কারুশিল্পের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। বাঙ্গালীর জাতিগঠনে জাতীয়সংস্কৃতি নির্মাণে অপরিহার্য সাংস্কৃতিকউপাদান ও সাংস্কৃতিকঅবস্থা হিসেবে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই, এদের চিন্তা চেতনায় এবং বক্তব্যে এটাই প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয়সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের অবক্ষয় রোধ ও এর পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম এক মহান জাতীয় কর্তব্য বলে বিষয়টি জাতির কাছে প্রাধান্য পায়। এই অবস্থার প্রেক্ষিত সহজেই অনুধাবন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। বিশ্ববরেণ্য শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন আবহমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একজন সচেতন মানুষ। তিনি অনুধাবন করেছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়কে চিরভাস্বর করে রাখতে হলে, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে সনাক্ত করতে হলে, তুলে ধরতে হবে জাতির-বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, রূপ, গঠন, রং এবং উপযোগিতা শিল্পাচার্যকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর শৈল্পিক অনুভব ও চেতনার প্রেরণা ছিল বাংলার গ্রামের সাধারণমানুষের লোক ও কারুশিল্প। জাতীয়সাংস্কৃতিক জীবনে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা আজকের এবং আগামী দিনের প্রজন্মের কাছে চিরজীবী, ক্রিয়াশীল এবং প্রবহমান রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলার লোক ও কারুশিল্পের মূল্যবান নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রেরগৌরবে বলীয়ান প্রতিটি স্বাধীন বাঙ্গালীর চেতনায় আবহমান বাংলার লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোককারুশিল্পের স্বরূপ সন্ধানের বিষয়টি সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রকাশ হিসেবে অগ্রাধিকার পায়। এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ

নিশ্চিত হওয়ার প্রেক্ষিতেই আবহমান বাংলাদেশের লোকজীবনের, লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের স্বাধীন বাংলার রাজধানী এবং মসলিন ও জামদানী বস্ত্র খ্যাত ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে ১৯৭৫ সালে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্বপ্ন সোনারগাঁয়ে "আদর্শগ্রাম"

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শৈল্পিক অনুভূতি ও চেতনায় ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীর রূপরেখা সম্বলিত একটি রূপকল্প–স্বপ্ন গড়েছিলেন। শিল্পাচার্য তাঁর শৈল্পিক অনুভূতি ও চেতনায় ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীর যে স্বপ্ন গড়েছিলেন তাঁর ভাষায় তা ছিল "আদর্শ গ্রাম"।[৩] (শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, বিনোদন ঃ ১৯৭৪) তাঁর স্বপ্নের পরিকল্পনায় ছিল, ইতিহাসের ও কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ সোনারগাঁয়ের বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য সম্বলিত উন্মুক্ত ও বিস্তৃত ভূমিতে এই আদর্শগ্রাম স্থাপিত হবে। তিনি বর্তমান লোকশিল্প যাদুঘর (পুরানো ভবন সরদারবাড়ী) কেন্দ্রিক ভূদৃশ্য সম্বলিত উন্মুক্ত স্থানটিকে আদর্শগ্রামের জন্য স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন "আদর্শগ্রামের অন্তর্ভূক্ত "লোক যাদুঘর" হবে সরদার বাড়ী"। তিনি লোকযাদুঘরকে "গ্রামীণ কুটির শিল্পের সংগ্রহশালা" নাম দিয়েছিলেন। শিল্পাচার্যের স্বপ্নের মূল বিষয় ছিল "আদর্শ গ্রাম"। তাঁর স্বপ্ন অনুযায়ী "আদর্শগ্রামের" কর্মসূচীতে কারুশিল্পীদের গ্রাম মুখ্য বিষয় সেই সঙ্গে "লোক যাদুঘর" অন্তর্ভূক্ত থাকবে। "আদর্শগ্রাম" প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বলেছিলেন "কামার, কুমার, তাঁতি, বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা, ছুতার, বাঁশবেতের কারিগর, ঝিনুক শিল্পীদের দ্বারা এই গ্রামে একদিন যে সব উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরি হবে তা শুধু ছাত্র, দেশীয় কিংবা সংগ্রাহকদের চাহিদাই মেটাবে না বিদেশী পর্যটকরাও আগ্রহ সহকারে সোনারগাঁয়ে গিয়ে উচ্চ মূল্যে সেসব শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করবেন।" শিল্পাচার্যের স্বপ্নের চিত্রকল্প "আদর্শ গ্রাম" একটি স্থানিক রূপ এবং কল্পনার একটি স্থানিকরূপে তিনি আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর বক্তব্যে তা প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে তাঁর কল্পনার সাংস্কৃতিক পরিবেশের স্থানিক রূপের মূল বিষয় ছিল প্রকৃতি, গ্রাম, গ্রামের বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, জলা, কারুশিল্প এবং কারুশিল্পীদের কর্মপরিবেশ। মূলতঃ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্র গ্রামের লোকজীবন ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ ও সৃষ্টি লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে শিল্পাচার্য তাঁর স্বপ্নকে একটি রূপকল্পের স্থানিক রূপ "আদর্শ গ্রামে" পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের

মৃত্যুর পর ফাউন্ডেশন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য ১৯৭৬ সালে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর" প্রকল্প হাতে নেয়। এবং কেবল অস্থায়ীভাবে লোকশিল্পযাদুঘর স্থাপন করা হয়। শিল্পাচার্যের স্বপ্নের "আদর্শ গ্রাম" নির্মাণে সোনারগাঁয়ে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে স্বপ্নের সাংস্কৃতিক পরিবেশের স্থানিক রূপের প্রতিস্থাপনের বিষয়টি প্রকল্পে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়।

লোক ও কারুশিল্প সংরক্ষণে এবং পুনরুজ্জীবনে জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর লোকজীবন ও উন্মুক্ত যাদুঘর

আমাদের দেশের জনসংখ্যার আশিভাগ মানুষের অর্থাৎ গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের জীবনধারা লোকজীবনধারা-লোকসংস্কৃতির সংগে সম্পৃক্ত, অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয় বস্তু, জিনিস, বস্তুজাত সংস্কৃতির উপাদান লোক ও কারুশিল্প বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান ও ঐতিহ্য হিসেবে এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে এবং জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীজাতির জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের স্বরূপ সন্ধানে লোক ও কারুশিল্পের অনিবার্য ভূমিকাকে তুলে ধরতে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। উল্লিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে উন্মুক্তযাদুঘর শ্রেণীর আধুনিক যাদুঘর ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের জাতিতত্ত্ব যাদঘরকে সাংস্কৃতিক যাদুঘরও বলা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাংলার প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশের স্থানিক, স্থাপত্যিক এবং লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টির কর্মপরিবেশের অবিকল প্রতিরূপের পরিকল্পিত অবকাঠামো প্রতিস্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমেই তা সম্ভব। প্রতিস্থাপিত কর্মপরিবেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষ কারুশিল্পীগণকে নির্দিষ্ট সময়ের কর্মসূচীর অধীনে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৌশল ও দক্ষতার বাস্তব এবং ব্যবহারিক প্রদর্শন ও উপস্থাপন দর্শকদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাসকেন্দ্রিক যাদুঘরগুলো একটি দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাসের ধারাকে, ইতিহাসের কালসমূহকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন, প্রদর্শনের জন্য কার্যক্রম চালায়। কিন্তু যেসব যাদুঘর জাতিতত্ত্ব যাদুঘর, উন্মুক্ত যাদুঘর বলে পরিচিত, ইউরোপে সেসব যাদুঘর কোন দেশের বা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক যাদুঘর হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে স্কাণ্ডিনেভিয় দেশসমূহ এ ধরনের যাদুঘরগুলোকে সাংস্কৃতিক যাদুঘর বলেই অভিহিত করে। স্কাণ্ডিনেভিয় দেশগুলোতে এই সাংস্কৃতিক যাদুঘর জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর বা পুরানো ধারায় অর্থাৎ যাদুঘর ভবনে প্রচলিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা অথবা উন্মুক্ত যাদুঘর পদ্ধতির প্রদর্শন ব্যবস্থা উভয় ধারা অনুসরণ করে এই ধারার সূচনা করে। অর্থাৎ ইউরোপের স্কাণ্ডিনেভিয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে নরওয়ের রাজধানী ওসলোর নিকটে বাইগডে। এছাড়া সুইডেনের স্টকহোমের স্কানসেন ও প্যারিসে উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে

শিল্পবিপ্লবপূর্বকালের ইউরোপের গ্রামীণ লোকসমাজের জীবনধারা, সাংস্কৃতিকজীবনের অনুপুংখ বিষয়কে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনীর প্রয়াস নেয়া হয়। উন্মুক্ত পরিবেশকেন্দ্রিক জাতিতাত্ত্বিক শ্রেণীর যাদুঘরগুলো প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনধারায় গঠিত ইউরোপের শিল্পবিপ্লবপূর্ব গ্রামীণ লোকজীবনধারা ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবেশকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিকপরিবেশ এবং সাংস্কৃতিকউপাদান লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ইউরোপের গ্রামীণমানুষের সাংস্কৃতিকঐতিহ্য দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে এই চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে এবং ঐতিহ্যের লোকশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টিতে এবং পুনরুজ্জীবনে জাতিতত্ত্বশ্রেণীর উন্মুক্ত যাদুঘরগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশেও শিল্পাচার্যের স্বপ্নের রূপকল্প "আদর্শ গ্রামের" স্থানিক রূপের অবকাঠামো নির্মাণ, উপস্থাপন ও প্রদর্শন কর্মসূচী বাস্তবায়ন হতে পারে কেবল বিশ্বের যাদুঘর ব্যবস্থাপনার ইতিহাসের নিরিখে অর্থাৎ জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর উন্মুক্তযাদুঘর পদ্ধতির কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

"ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ"-"রূপসী বাংলাদেশ"

এই প্রেক্ষিতে বাঙ্গালীরসংস্কৃতির ক্ষেত্র আবহমান বাংলার গ্রামের লোকজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্বপ্নের রূপকল্প "আদর্শগ্রামের" স্থানিক ও সাংস্কৃতিক রূপের অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোগত রূপ নির্মাণে জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর উন্মুক্ত যাদুঘর পদ্ধতির অনুসরণে ১৯৭৯ সালে গবেষণামূলক প্রস্তাব "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ"।[৪] (আলমঃ ১৯৭৯) উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবে সোনারগাঁয়ে ১৫০ বিঘা আয়তনের সাধারণ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য সম্বলিত স্থানে খোলা আকাশের নীচে বাংলার বৈশিষ্ট্যময় প্রকৃতি ও গ্রামের পরিবেশে গ্রামীণরূপকেন্দ্রিক এদেশের সাধারণ মানুষের শৈল্পিক কর্মপ্রবাহের পরিচয় লোক ও কারুশিল্পের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিকউপাদান ও গুণ তুলে ধরতে জাতিতত্ত্বযাদুঘর শ্রেণীর সাংস্কৃতিক, লোকজীবন - উন্মুক্তযাদুঘর গড়ে তোলার কথা বলা হয়। "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" প্রস্তাবে লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টির সংগে সম্পৃক্ত কারুশিল্পীদের চলমান জীবনের গ্রামীণ কর্মপরিবেশের স্থানিক অবস্থানে উপস্থাপন এবং সর্বপরি উল্লিখিত ১৫০ বিঘা ভূমিকে একটি অখণ্ড স্থান হিসেবে সেখানে বাংলার সাধারণ প্রকৃতি, পুকুর, জলাশয়, গাছপালা, আঁকাবাঁকা খাল, পায়ে চলার পথ, গ্রামীণ ঘরবাড়ি, কারুশিল্পীদের কর্মপরিবেশসহ সবুজদিগন্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উল্লিখিত লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ও কারুশিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ স্থাপনের

লক্ষ্যে গ্রামবাংলার পরিবেশকেন্দ্রিক একটি স্থানিক আয়োজন, কমসূচী দর্শক ও আগামী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের কথা বলা হয়। মূলতঃ শিল্পাচার্যের স্বপ্ন-রূপকল্প "আদর্শ গ্রামের" চেতনার প্রেক্ষিতে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" নামের একটি পরিবেশকেন্দ্রিক স্থানিক প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮০ সালে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সোনারগাঁয়ে ১৫০ বিঘা আয়তনের সাধারণ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য সম্বলিত স্থানে খোলা আকাশের নীচে বাংলার প্রকৃতি ও গ্রামের পরিবেশে গ্রামীণ রূপকেন্দ্রিক এদেশের সাধারণ মানুষের শৈল্পিক পরিচয় লোক ও কারুশিল্পের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান, গুণ, বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বা উন্মুক্ত যাদুঘর গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়। এভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পরিকল্পিতভাবে জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর উন্মুক্ত যাদুঘর বা লোকজীবন যাদুঘর পরিকল্পনা কার্যক্রম "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসূচী গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীতে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য উন্মুক্ত যাদুঘর পদ্ধতির কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর" কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে সোনারগাঁয়ে ১৫০ বিঘা আয়তনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিকল্পিত স্থাপত্যিক নকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের কৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম আঁকাবাঁকা খাল, গাছগাছালিসহ সবুজ দিগন্ত ও প্রান্তর নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মিত কৃত্রিম আঁকাবাঁকা খাল পরিবেষ্টিত ১৫০ বিঘা আয়তনের ভূমিতে এ পর্যন্ত সৃষ্ট প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য ও লোকজ পরিবেশে কারুশিল্পগ্রাম এবং সর্বপরি ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" যা মূলতঃ "রূপসী বাংলাদেশ" এ পরিণত হবে। "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" বা "রূপসী বাংলাদেশ" হবে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবশেকেন্দ্রিক লোকজীবনের বিশেষ করে লোক ও কারুশিল্প, শিল্পী এবং কর্মপরিবেশের স্থানিক রূপের কৃত্রিম উপস্থাপন। এর সংগে সংশ্লিষ্ট থাকবে গ্রামীণ লোকজপরিবেশে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্পগ্রাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় গ্রামীণ স্থাপত্যের সুনির্দিষ্ট পরিচয়ের অবিকল মডেল। সবকিছু মিলিয়ে যে স্থানিক অবকাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক রূপ সৃষ্টি হবে তাই "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ'-"রূপসী বাংলাদেশ"। একটি সুসংহত লোকসাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। বাংলার গ্রামীণ লোক জীবনের প্রতিস্থাপন।

কারুশিল্পগ্রাম

"কারুশিল্পগ্রাম" ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ-রূপসী বাংলাদেশ এর অন্তর্ভূক্ত একটি কর্মসূচী। এটি "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" কর্মসূচীর সম্পূরক। ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ এখানে জাতিতাত্বিক শ্রেণীর উন্মুক্তলোক যাদুঘর বলে পরিগণিত হবে। "কারুশিল্পগ্রামে" বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে কারুশিল্পীর বাস্তব কর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা যাবে। আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপের বাস্তব অবকাঠামোর কৃত্রিম উপস্থাপন, গ্রামীণ স্থাপত্য, নদীনালা, গাছ-পালা, পুকুর ও মানুষ অর্থাৎ গ্রামীণ লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল লোক ও কারুশিল্পের দক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের সমারোহ ঘটানোই হবে "কারুশিল্পগ্রামের" কাজ।[৫]

"কারুশিল্পগ্রামে" বাংলার চিরায়ত গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কারুশিল্পীগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা কারুশিল্পের উৎপাদনের প্রদর্শন করবে। যেসব কারুশিল্পের নিদর্শন এখন আর তৈরি হচ্ছে না বা হারিয়ে যেতে বসেছে, যাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে তা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। "কারুশিল্পগ্রাম" প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত পর্যায়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। (ক) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, (খ) দেশের সংস্কৃতি অঞ্চলসমূহ সনাক্ত করা। (গ) সংস্কৃতি অঞ্চল সমূহের বৈশিষ্টময় কারুশিল্পের নাম ও দক্ষ কারুশিল্পীর তালিকা প্রণয়ন। "কারুশিল্পগ্রামে" দেশের সংস্কৃতিঅঞ্চলসমূহের বৈশিষ্ট্যময় কারুশিল্পের উৎপাদন প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট কারুশিল্পের দক্ষ কারুশিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানোর কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব হবে। এবং বৈশিষ্টময় কারুশিল্পের উৎপাদন ও অলংকরণ প্রক্রিয়ার প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া, রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় গবেষণা এবং উৎপাদন ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

"কারুশিল্পগ্রামে" বর্তমানে ৮টি ঐতিহ্যিক কারুশিল্পের স্থানিক, স্থাপত্যিক ও কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী কারুশিল্পগ্রাম কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রস্তাবগুলো ঃ

ক. মৃৎশিল্প
খ. দারুশিল্প
গ. বাঁশ বেত কারুশিল্প
ঘ. ঝিনুক, মুক্তা ও শাখার কারুশিল্প
ঙ. বস্ত্র ও বস্ত্রজাত কারুশিল্প

চ. পাটজাত কারুশিল্প
ছ. তামা, কাসা, রূপা কারুশিল্প
জ. হস্তনির্মিত কাগজের কারুশিল্প।

মূলতঃ "কারুশিল্পগ্রামে" লোকজীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক গ্রামের সাধারণমানুষের ঘরবাড়ি বিশেষ করে অঞ্চল ভিত্তিক কারুশিল্পীদের ঘরবাড়ি সম্বলিত গ্রামীণ স্থাপত্যের অনুপুংখের বাস্তব গঠন ও গড়নের অবকাঠামো প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে। কারুশিল্পগ্রামে বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক প্রকৃতি পরিবেশের ঘরবাড়ির চেহারা, বৈশিষ্ট্য, জীবনধারার পরিবেশ, বিশেষ করে কারুশিল্পীদের ঘরবাড়ি ও কর্মপরিবেশের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। অর্থাৎ শিল্পগ্রামে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্টের বৈচিত্রময় লোকজস্থাপত্যের প্রাচীন রূপের সাধারণ চলমান রূপের ধারাকে তুলে ধরতে হবে।

কারুশিল্পীরা কারুশিল্পগ্রামে কাজ করবে। লোকশিল্পযাদুঘরে লোকশিল্পের নিদর্শনাদি সংরক্ষিত হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য উৎপাদনপ্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলবে। সেই সংগে লোকজীবনে লোকজীবনধারায় বারমাসে ১৩ পার্বণ পালনের ঐতিহ্যের অনুসরণে ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে প্রতিবছর শীতকালীন লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন, ফাউন্ডেশনের সকল কর্মসূচীর সংগে কারুশিল্পের, কারুশিল্পীর ও দর্শক, পর্যটকদের একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করবে। কর্মসূচীসমূহ আলাদা, বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না। "কারুশিল্পগ্রাম" কর্মসূচী ফাউণ্ডেশনের সামাগ্রিক কর্মসূচী "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ–রূপসী বাংলাদেশ" এর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

"কারুশিল্পগ্রামে" কারুশিল্প তৈরি, কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে বাংলার অঞ্চলভিত্তিক লোকজীবনধারার বহুমাত্রিক দিক, অনুষঙ্গকে প্রত্যক্ষ দলিলীকরণ করে তার প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হবে। এ সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থ ও বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চলভিত্তিক লোকজীবনধারার রূপের, গড়নের বৈশিষ্ট্য, লোকজস্থাপত্যের প্রত্যক্ষ বিবরণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ স্থাপত্যের প্রাচীন ধারা যা এখনো অব্যাহত রয়েছে তার একটা সাধারণ ভিত্তি নির্ধারণে গবেষণার ভিত্তিতে ঐক্যমত্য পোষণ করে অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত "কারুশিল্পগ্রাম" প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক কারুশিল্পীদের সাধারণ ঘরবাড়ীর বৈশিস্ট্য বিশেষ প্রাধান্য পাবে।

ফাউণ্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরে যেসব লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা তা একান্ত স্বদেশীয়। আবহমান বাংলার। এতে স্বদেশীয় মানুষের

জীবনধারা, স্বদেশীমানুষের বস্তুজাতসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সংস্কৃতিঅঞ্চলসমূহের স্থানিক ও কালিক বৈশিস্ট্য রয়েছে। ক্ষুদ্রাকারবাংলাদেশ–রূপসীবাংলাদেশ এর লোক ও কারুশিল্পযাদুঘর ও কারুশিল্পগ্রাম গ্রামবাংলার সাধারণমানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের একটি সুনিদৃষ্ট কর্মসূচী বলে পরিগণিত হবে।

লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক। জীবনের জীবনধারার মতই সচল। স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ, পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতি-সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যেমন সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের ধারায় প্রবহমান থাকে, তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক সংস্কৃতির বস্তুজাতসংস্কৃতি লোক ও কারুশিল্প প্রবহমান সচল। "কারুশিল্পগ্রাম" কর্মসূচী বাংলার লোক ও কারুশিল্পের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষাপটের বহুমাত্রিকতাকে উপস্থাপন করবে। "কারুশিল্পগ্রাম" ধারণ করবে বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের স্থানিক ও ভৌত অবকাঠামোগত রূপ, লোক ও কারুশিল্পের উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীর কর্মপরিবেশের অনুপুংখ রূপ এবং এই পরিবেশে কারুশিল্পীর উপস্থিতি। সবকিছু কৃত্রিমভাবে হলেও "কারুশিল্পগ্রামে" মোহনীয়ভাবে দর্শকদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে জাতির লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোক ও কারুশিল্প।

তথ্য নির্দেশ

১. সৈয়দ মাহবুব আলম, লোক ও কারুশিল্পের সংজ্ঞা, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন-১৯৯১।

২. Encyclopaedia Britannica. 1986 Vol 16P-324.

৩. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাক্ষাৎকার, সাপ্তাহিক বিনোদন-১৯৭৪।

৪. সৈয়দ মাহবুব আলম , লোকশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম-"ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ", বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, পৃঃ ১-৬, ১৯৭৯।

৫. কারুশিল্পগ্রাম নীতিমালা ১৯৯৫, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

লোক ও কারুশিল্পের গতি ও প্রবহমান ধারা

গ্রামের শিল্পী ও কারিগর তার চারপাশের চেনা প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশজাত উপকরণ দিয়ে বা উপকরণের প্রভাবে লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি করে থাকে। লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টি রূপপরিগ্রহ করে নানা আকারে, গড়নে ও নকশায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ অবদান লোক ও কারুশিল্প। এভাবেও বলা যায়, লোক ও কারুশিল্পের রূপ ও নকশা নির্মাণের চিত্রকল্প, লোকশিল্পী গ্রহণ করে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে। প্রকৃতির সকল উপকরণ থেকে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশে জীবনযাপনকারী মানুষ অনিবার্যভাবে লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের সকল উপকরণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, গুণ, নমনীয়তা, বর্ণাঢ্যতা, উপরিতলের বুনটগুণ, স্বচ্ছতা ঔজ্জ্বল্য, ও দ্যুতিগুণ ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করেছে। এ সবের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছে। এর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সবই জীবনেরসংগ্রামে বেঁচেথাকার তাগিদে, প্রয়োজনে। হাত ও হাতিয়ারের সম্মিলনে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণকে ব্যবহার করে জীবনের প্রয়োজনে, উপযোগিতার নিরিখে মানুষ নানা আকার, গড়ণের বস্তু সৃষ্টি করেছে। বস্তুতে নকশা, গড়ণে বৈশিষ্ট্য ও রূপ এনেছে। সৃষ্টি হয়েছে লোক ও কারুশিল্প।

লোক ও কারুশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর, তেমনি এর আকার, গড়ন, নকশা এবং উপরিতলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে অনুসৃত হয়েছে প্রকৃতির অবাধ, অফুরন্ত উপকরণের গড়ন, বৈশিষ্ট্য ও নকশাকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতি ও পরিবেশ হচ্ছে মৌলিক গড়ন ও নকশার রূপকার, সুতিকাগার-ভান্ডার। প্রকৃতির উপকরণ ও উপকরণের অন্তর্গত নকশার চয়ন এবং লোকশিল্প, কারুশিল্প তৈরিতে এর অনিবার্য প্রয়োজন, ব্যবহারের তাগিদ, পরিবেশে মানুষের জীবনযাপন-সংস্কৃতি ধারায় নিহিত। আমাদের দেশের লোক ও কারুশিল্পীগণও অনুরূপভাবে প্রতিনিয়ত ঐতিহ্যের অনুশীলনে কৌশল ও দক্ষতার সাহায্যে নানা উদ্ভাবনীর মধ্য দিয়ে উপকরণের বিচিত্রগড়ন, আকার, রং এবং উপকরণের বহিপৃষ্টের, উপরের স্তরের, তলের চেহারা, চরিত্র ও বুনটের বৈশিষ্ট্যকে তাদের তৈরি লোকশিল্প, কারুশিল্পে ব্যবহার করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এবং প্রকৃতির উপকরণ ও উপাদানে নিহিত অনিবার্য নকশাগুণকে কারুশিল্পী লোক কারুশিল্পে

ব্যবহার করে। এর ফলে লোক ও কারুশিল্প ধারণ করতে সক্ষম হয় শৈল্পিক নমনীয়তা ও শিল্পের প্লাষ্টিকগুণ।

গ্রামের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ফসল লোক ও কারুশিল্প। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যের মতই লোক ও কারুশিল্প সচল, প্রবহমান, ক্রমপুঞ্জিত ধারায় ধারাবাহিক। প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ (acculturation) ও পরিব্যাপ্তিকরণ (diffusion) প্রক্রিয়ার ধারায় সৃষ্টির নতুন নতুন পথ পায়, রূপান্তরিত হয়। প্রতিনিয়ত রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় লোক ও কারুশিল্প সচল, আগামী দিনের জন্য টিকে থাকার সম্ভাবনার গুণকে ধারণ করে আছে। মূল বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা, কাঠামো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ধারায় লোক ও কারুশিল্প আবহমানকালের ঐতিহ্যকে যেমন ধারণ করে আছে, তেমনি আজকের প্রয়োজনে টিকে থাকার জন্য সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। আর আগামীদিনেও টিকে থাকতে আজকের প্রেক্ষাপটে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ ও প্রয়োজনে এই রূপান্তর। এই শক্তি, সম্ভাবনা লোক ও কারুশিল্প এবং কারুশিল্পীর মধ্যে যুগপৎ ক্রিয়াশীল। রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে লোক ও কারুশিল্পের প্রবহমানতা, চিরায়তগুণ সকল কালের মানুষকে মোহিত, অনুপ্রাণিত এবং একাত্ম করে।

লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক বলেই এর রূপান্তরের প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক রূপান্তরের অনুরূপ। এই রূপান্তরের প্রেক্ষিত, কারণ আর্থ -সামাজিক-সাংস্কৃতিক। লোক ও কারুশিল্প এই প্রেক্ষিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রূপে, গড়নে, বৈশিষ্ট্যে প্রতিনিয়ত বৈচিত্রকে আহ্বান জানায়। নতুন নতুন রূপান্তরিত সাজে কালিক ব্যবধানে আত্মপ্রকাশ করে। লোকমনের, সমাজপরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চাহিদা মেটাতে লোক ও কারুশিল্পী লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টিতে চিরায়ত প্রাকৃতিক উপকরণ, পূর্ব পুরুষ থেকে প্রাপ্ত কৌশল, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনীগুণের প্রকাশ হিসেবে ঐতিহ্যের লোকজগড়নে নবনব সাজে, রং এ বৈচিত্র আনেন তার সৃষ্টিতে। মূলতঃ লোকশিল্প, কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যে সাধারণ নমনীয়তা, মানিয়ে নেয়ার গুণ লোকও কারুশিল্পকে চলমান করেছে।

রূপান্তরের ধারায় পুনরুজ্জীবন। কারুশিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস। বিশ্বের সকল দেশে লোক ও কারুশিল্পকে স্বপ্নের, মর্যাদার, জাতীয় পরিচয়ের, ঐতিহ্যের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব ঐতিহ্যগত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের লোক ও কারুশিল্পের দ্রুত মর্যাদাহানী, অধোপতনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। এবং এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই ইউরোপের ফোকলোরিষ্ট, জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ গ্রামীণ লোক ও কারুশিল্পকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে যতদূর সম্ভব নিদর্শন সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প

যাদুঘর, শিল্পগ্রাম, খোলা যাদুঘর, কৃষিযাদুঘর স্থাপন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল লোকজ ঐতিহ্যেরধারা-লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধান। এ প্রসংগে সুইডেন, ডেনমার্ক, মেক্সিকো এবং জাপানের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এসব দেশে লোককারুশিল্প-কারুশিল্পের ঐতিহ্যিক পণ্যকে বিশ্ববাজারের উপযোগী করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজিয়েছে, পুনর্বিন্যাস্ত করেছে। ফলে এসব দেশে লোক ও কারুশিল্প যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদার প্রতীকও বটে।[১] এসব দেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা লোক ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সার্থকতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহ্যের লোক কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রসংগে জার্মান কারুশিল্প বিশেষজ্ঞের মতামত এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

"In the course of thousand years the exponents of fine craftsmanship in Germany have continually adapted themselves to economic, technological and social change without abandoning the essential ingredients of their tradition: artistic conception and masterly execution of works of craftsmanship"

"The craftsmen were not content merely to perpetuate traditional folk art or to copy exemplary products of bygone ages. They continued to assess critically what had been handed down to them and to set their own creative stamp on it."[২]

উল্লিখিত দেশসমূহের সাফল্যের অভিজ্ঞতা গত তিন দশকে এশিয়া ইউরোপের আরো বহুদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে থাইল্যাণ্ড, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, কোরিয়া, মালয়েশিয়া অনুরূপভাবে লোক ও কারুশিল্পের চাহিদাকে বিশ্ববাজারে প্রসারিত করতে রূপান্তরের ধারায় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। লোক ও কারুশিল্পের সনাতন, ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণ লোক সমাজতো রয়েছেই, সেই সংগে বিজ্ঞান, আধুনিকতা, প্রযুক্তির কল্যাণে স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বনাগরিক কসমোপলিটন মানুষের চাহিদাকেন্দ্রিক বিশ্ববাজার যুক্ত হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, ঐতিহ্যের কারুশিল্পেরধারা ও কৌশল আধুনিক শিল্পপণ্য উৎপাদনের ভিত্তি। অর্থাৎ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনের ভিত্তিই হচ্ছে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের ধারা। অর্থাৎ ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের স্থানটি ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর আধুনিক শিল্প উৎপাদন-পণ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে। বোধকরি একথা বললে কোন অত্যুক্তি হবে

না যে, আধুনিক শিল্পপণ্যের পূর্বধারা হচ্ছে লোক ও কারুশিল্প[৩]। পৃথিবীর শিল্পউন্নত দেশগুলোতে লোক ও কারুশিল্পের রূপান্তর প্রক্রিয়ার ছাপ আধুনিক শিল্পপণ্যের গড়নে, নকশায়, রংএ প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া ভিন্ন ও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। কোথাও এই প্রেক্ষিতে রূপান্তরের প্রক্রিয় সক্রিয়, বেগবান, কোথাও বেগবান নয়। কিন্তু তাই বলে জড়, মৃত, প্রাণহীন নয়, কোন না কোনভাবে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় লোকশিল্প, কারুশিল্প সূক্ষ্ম রূপান্তিরিত হয়ে চলছে। এমনকি ঐতিহ্যের ক্ষীণ ধারাকে হলেও অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পও এ দেশের প্রকৃতি পরিবেশ ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। সংস্কৃতির গতিময়তা, ও চলমান গতিধারার মত এদেশের লোকশিল্প। লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় লোকমনের চাহিদা, রুচির সংগে তাল মিলিয়ে এবং আধুনিক বিশ্ববাজারের চাহিদার নিরিখে সময়, কালের ব্যবধানে ক্রমাগত সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ায়, চলমান, সক্রিয় থাকার শক্তি ও সম্ভাবনাকে ধারণ করে আছে। প্রতিনিয়ত বিচিত্র ধারায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় লোক ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে এদেশের প্রকৃতি, পরিবেশের বৈশিষ্ট্যময় উপকরণ ও কারুশিল্পীর বংশ পরম্পরায়ের কৌশল ও দক্ষতার গুণে। এ বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের। এ দেশের সংস্কৃতির। এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত উপকরণ গাছপালা, মাটি, ফল, ফুল, বীজ, আঁশ ইত্যাদির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, গুণ, নমনীয়তা, বর্ণাঢ্যতা, উপরিতলের বুনটগুণ, স্বচ্ছতা, ঔজ্জ্বল্যগুণ বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পকে বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই আধুনিক জীবনযাপনের সংগে লোকশিল্পের নানা জিনিস, পণ্যের সম্মিলন ঘটেছে। এখন লোক ও কারুশিল্প কেবল গ্রামের লোকসমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন লোক ও কারুশিল্পের নানা জিনিস, পণ্য আধুনিক জীবনযাপনের সংগে সম্পৃক্ত হয়েছে। লোককারুশিল্পের পণ্যে যে উপকরণ, কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় নানা পণ্যে তা আরোপ করার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। যেমন মাটি, বাঁশ, বেত, কাঠের লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে বহুদেশে ঐতিহ্যের লোকশিল্পের পাশাপাশি আধুনিক জীবনের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ফুলদানি, ছাইদানি, ট্রে ইত্যাদি। এসব জিনিস আধুনিক জীবনের অথচ তৈরি হয়েছে, বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে লোকশিল্পের উপকরণ ও কাঁচামালের নিজস্ব গড়ণ এবং প্লাষ্টিকগুণ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে সুইডেন, র্জামানী, জাপান, চীন, থাইল্যাণ্ড, ভারত, মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা বিবেচনার দাবি রাখে।

এ প্রসংগে জার্মান পণ্ডিত ভিক্টর জেলজারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "Folk art has never been a static, unchanging medium. It has

certainly been marked by development, individual peaks of achievement, spontaneity of invention and above all, by many a change. For instance, the colourful technique of slip decoration was never a part of Bavarian folk art but today at Oberammergan for example, attractive painted ware decorated with entirely local motifs is executed in this fashion."[৪]

লোক ও কারুশিল্পের দেশীয় বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যকে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করে লোক ও কারুশিল্পের সম্ভাবনা এবং রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবনের পথকে সুগম করেছে। লোক ও কারুশিল্প লোকজ ঐতিহ্য লোকসমাজের, লোকমনের চাহিদার সীমাবদ্ধতা থেকে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় আধুনিক জীবনের চাহিদার নিরিখে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে বিশ্বের সকল দেশেই লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা এবং রূপান্তরিত আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের পণ্যকেন্দ্রিক কারুশিল্প যুগপৎ তৈরি হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা ঐতিহ্যগত ও আধুনিক জীবনের প্রয়োজন, উপযোগিতার ক্ষেত্রে লোক ও কারুশিল্পের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও এর রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য এবং গুণের সম্ভাবনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে লোক ও কারুশিল্প সময়ের, কালের ব্যবধানে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পও অনুরূপ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয়ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদার উজ্জীবনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোকও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন উদ্যোগ, কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব পায়। জাতীয় পর্যায়ে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে সচেতন প্রয়াস চলে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের মত বিশেষ যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়ং। অন্যান্য যাদুঘরে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যিক পণ্যকে বিশ্ববাজারের উপযোগী করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়াস ও উদ্যোগ চলে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা, কারুশিল্পের উৎপাদক-বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রমাণ, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয় যে, বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ কারুশিল্পীদের তৈরি লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের নকশাকে আধুনিক জনরুচি, চাহিদার আলোকে কারুশিল্পে বৈচিত্র আরোপ করা হলে আজকের আধুনিক, পরিবর্তিত রুচি ও আবেদনের

জীবনযাপনকেন্দ্রিক বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। এসব সংস্থাসমূহ উপকরণের গুণগতমান, কারুশিল্প তৈরির ঐতিহ্যগত দক্ষতা ও নকশার ব্যবহারকে নিশ্চিত করেছে তাদের পরিচালনে, পরিকল্পনায়, ফরমায়েসে তৈরি নতুন কারুশিল্প উৎপাদনে। এ প্রসংগে নকশী কাঁথার পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এভাবেই ঐতিহ্যের কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন উদ্যোগ, প্রয়াস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট রূপান্তরিত কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এখনকার তৈরি নকশী কাঁথা। নকশী কাঁথার ঐতিহ্যের (সেলাই, মোটিফ, দক্ষতা, কৌশল) উপর নির্ভর করে নতুন কারু পণ্য সৃষ্টি হলো। এসবের মধ্যে রয়েছে পোষাক, কুশন কভার, টেবিল ম্যাট, ষ্টেশনারী দ্রব্য ইত্যাদি[৬]। নকশীকাঁথার পুনরুজ্জীবনকেন্দ্রিক এই রূপান্তর ধারণ করে আছে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-জাতিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টিতে, রূপান্তরে, পুনরজ্জীবনে এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কাঁচামাল, উপকরণ কারুশিল্পীকে সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। বৈচিত্রের লোক ও কারুশিল্প কারুশিল্পীর সৃষ্টিতে রূপ লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. International Encyclopaedia of Social Science.

২. Zentral Verbnand dos. Deutschen Handwerk Bonn, The Fine Crafts in the Federal Republic of Germany.

৩. Subrata Banerjee; Bangladesh, National Book Trust New Delhi, 1981. p. 41

৪. Victor Zelger: The Fine Crafts in the Federal Repaublic of Germany.

৫. Syed Mahbub Alam, Folk Art Museam and Crafts village "Miniature Bangladesh" Bangladesh Folk Art & crafts Foundation, Sonargaon 1979.

৬. Martha Chen. Revival of Crafts in Bangladesh, 1984.

মৃৎশিল্পীর চাকতিতে মাটির হাঁড়ি বানানো। পৃ: ৯

মৃৎপাত্র শুকানো ও পেটানো। পৃ: ৯

পোড়ামাটির পুতুল, দন্ডায়মান মহিলা (কিশোরগঞ্জ)। পৃ: ৯

পোড়ামাটির পুতুল, মা ও শিশু (কিশোরগঞ্জ)। পৃ: ৯

পোড়ামাটির পুতুল, চাকাওয়ালা ঘোড়া (কিশোরগঞ্জ)। পৃ: ৯

পোড়ামাটির ফলক। পৃ: ৯

রাজশাহীর শখের হাঁড়ির শিল্পী সুশান্ত কুমার পাল। পৃ: ২০

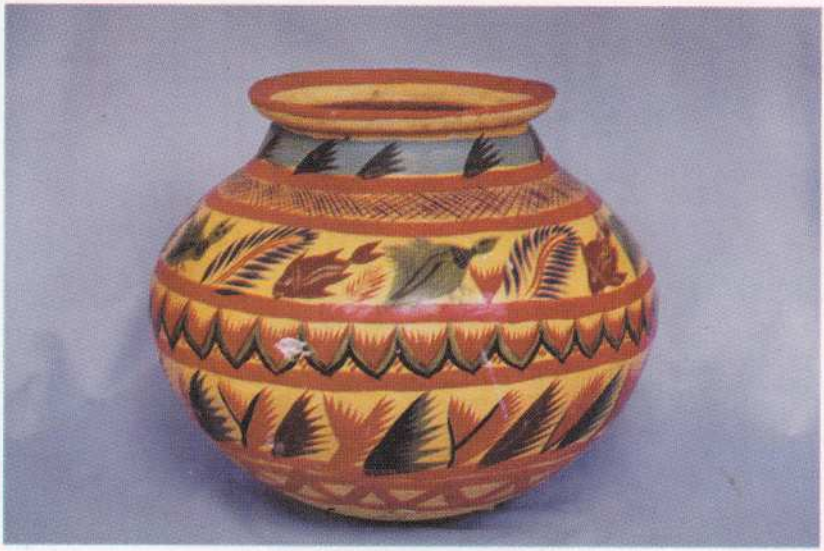

শিল্পী সুশান্ত কুমার পালের তৈরি রাজশাহীর শখের হাঁড়ি। পৃ: ২০

জামদানী তাঁতে কর্মরত বয়ন শিল্পী। পৃ: ২৯

জামদানী শাড়ী, রূপসী, রূপগঞ্জ। পৃ: ২৯

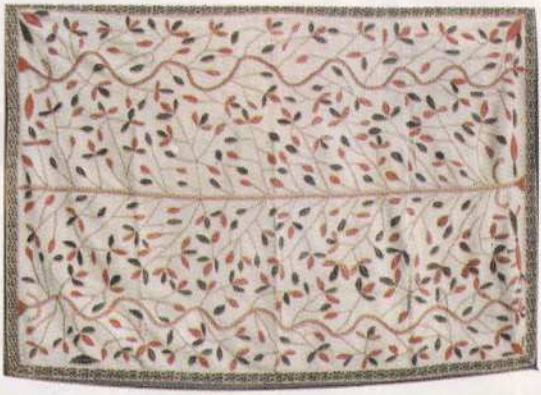

নকশী কাথা। পৃ: ৩৬

নকশী কাথা (আসন)।

ময়ূর পংখী নৌকায় নকশা তৈরিতে কর্মরত দারুশিল্পী। পৃ: ৫৭

ফাউন্ডেশনের লেকে ভাসমান ময়ূরপংখী নৌকা। পৃ: ৫৭

সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের খেলনা ঘোড়া ও হাতি। পৃ: ৫৭

সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের খেলনা হাতী। পৃ: ৫৭

বাঁশের দরমা (কিশোরগঞ্জ)। পৃ: ৭২

লোকজ মঞ্চ (সনের, বাঁশের), বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ। পৃ: ৭২

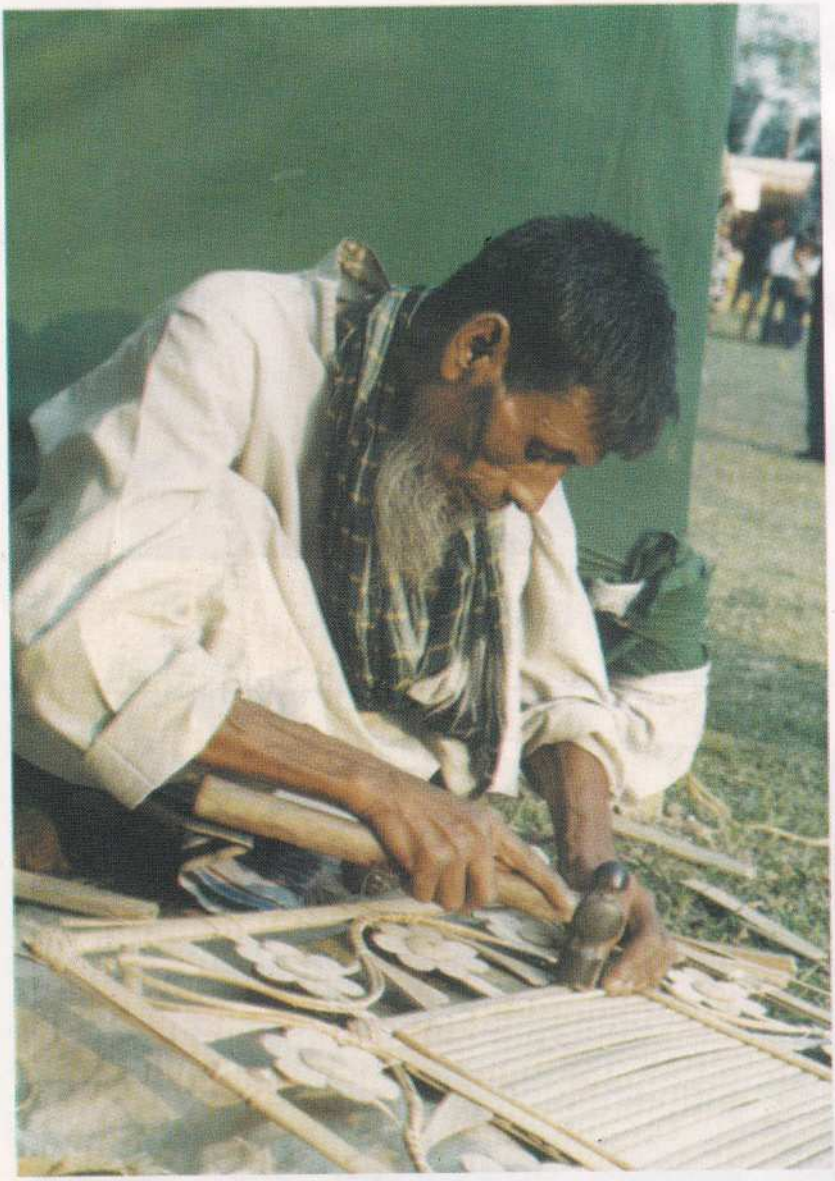

মানিকগঞ্জের বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদ। পৃ: ৭২

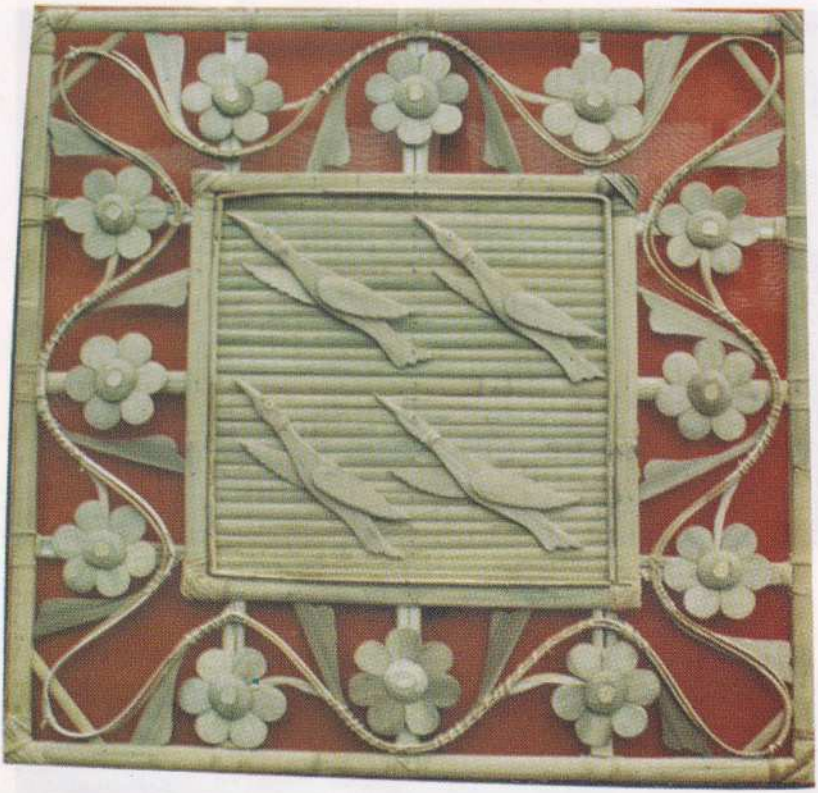

বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদের শিল্পকর্ম অলংকৃত বাঁশের কারুশিল্প। পৃ: ৭২

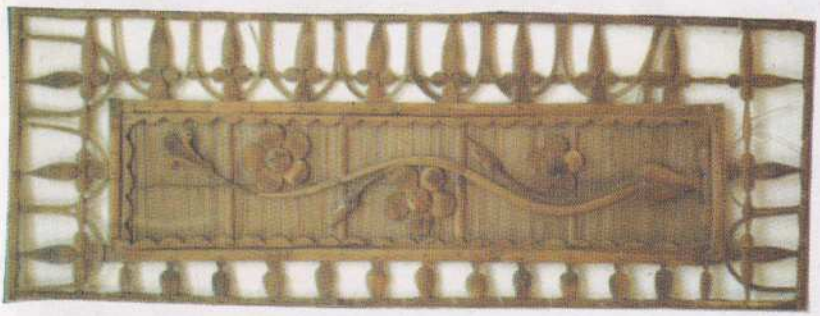

২১. বাঁশের কারুশিল্পী আব্দুল হামিদের শিল্পকর্ম অলংকৃত বাঁশের কারুশিল্প। পৃ: ৭২

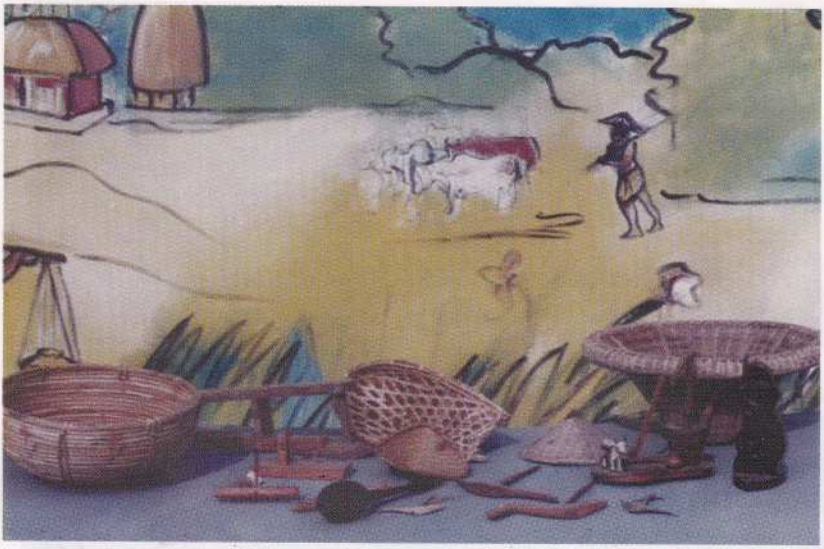

বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির উপাদান কৃষি সরঞ্জাম। পৃ: ৯০

বাংলাদেশের বস্তুজাত সংস্কৃতির উপাদান গার্হস্থ্য জিনিস - হাড়ি,পাতিল ইত্যাদি। পৃ: ৯১

ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, রূপসী বাংলাদেশ এর ভূদৃশ্য। পৃ: ১০৪

ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, রূপসী বাংলাদেশ এর ভূদৃশ্য। পৃ: ১০৪

ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, রূপসী বাংলাদেশ এর ভূদৃশ্য। পৃ: ১০৪

ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম - 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' রূপসী বাংলাদেশ -এর শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের দৃশ্য। পৃ: ১০৪